প্রথম প্রকাশ ঃ ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

গ্রন্থসত্ত্ব ঃ শ্রীমতী মঞ্জু হাজরা
১৭।১২।২ শশীভূষণ সরকার লেন
সালকিয়া । হাওড়া

প্রকাশক ঃ স্বপন নন্দী এম.এ

মুদ্রক ঃ দাশ প্রেস, পেঁড়ো, হাওড়া

আচার্য ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষ

শ্রীচরণেষু

সূচী

বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা ও শরৎচন্দ্র / ৯
বাংলার পল্লীসমাজের ভাষ্যকার / ২৬
জনগণের শিল্পী / ৩৬
সমাজতান্ত্রিক চেতনা / ৪০
পল্লীসমাজ : সমাজ চিন্তার শিল্পরূপ / ৪৭
শিশুচরিত্র / ৭২
বৈকুণ্ঠের উইল : পারিবারিক জীবনের দলিল / ৮০
প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্র / ৮৪

পরিশিষ্ট :

শরৎচন্দ্রের জীবন ও ঘটনাপঞ্জী / ৯০
শরৎসাহিত্য—স্বদেশে বিদেশে / ৯৭



জন্ম	মৃত্যু
১২৮৩ সাল, ৩১শে ভাদ্র	১৩৪৪ সাল, ২রা মাঘ
(১৮৭৬)	(১৯৩৮)

বিশ্বসাহিত্যপরিক্রমা ও শরৎচন্দ্র

মোটামুটি ভিক্টোরীয় যুগের অবসান ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। নবযুগের সূচনা ভিক্টোরীয় যুগের অবসানে। নতুন যুগে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দুর্নির্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। জীবনের সার্বিক গতি পরিবর্তিত হয়েছে, সার্বিক চেতনাবোধ শিল্পীচিত্তকে নাড়া দিয়েছে। সাহিত্য গড়ে উঠেছে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। সম্ভবত বিজ্ঞানের বাস্তব আঘাতে সামাজিক জীবনে বিরাট ভাঙন দেখা দিয়েছিল। মানুষের সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি পরিস্থিতিগুলির স্রষ্টা কে সে— বিধাতা, না সে নিজে— এই প্রশ্ন জেগেছিল।

তাই এই যুগেই বাস্তব জগতের সঙ্গে মানবমনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল মনোবিজ্ঞান। ফলে সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়েছে আত্মানুসন্ধিৎসা, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত বস্তুর মত পরিবর্তনশীল। দার্শনিক মনন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমন্বয়সাধন ঘটেছিল এযুগের সাহিত্যে। সুচারু মনোবিশ্লেষণের প্রয়াসও লক্ষণীয়। দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নতুনত্ব অনবদ্য। আবহকালের রাষ্ট্র-সমাজ-অনুশাসিত বেড়াগুলি ভেঙে মানুষের জয়গান ঘোষিত হয় এই আধুনিক যুগে,—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

এই নবজাগ্রতবোধ মানবজীবনের তির্যক আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে, সাধারণ মানুষের মনে আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে, যুগ-যুগান্তরের সংস্কার-মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সাধারণ মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়েছে। সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তনের চিন্তায় মানুষ দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছে। তারই ফলস্বরূপ ঔপন্যাসিকের শিল্পস্বভাবের মূলে অপরিহার্যভাবে নিহিত হয়েছে যুক্তি-বিচার-সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং পরিবেশসচেতন বাস্তব জীবনবুদ্ধি। ('মানবচেতনাকে যুগোচিত ব্যাপ্তি ও গভীরতার সঙ্গে অঙ্কিত করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকেই এই উপন্যাসের উদ্ভব।' বিংশ শতাব্দীতে উপন্যাস একটি আধুনিক কলারূপ (art from)। আজকের উপন্যাসে জীবন-অনুভবের

তীব্রতা অনিবার্য। এই উপন্যাসশৈলীর জন্ম প্রেরণার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করে Sir Ralph Fox যথাযথ মন্তব্য করেছেন বলে আমার বোধ হয়—"The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to take the whole man and give him expression" বাস্তবিক তাই। একটি মানুষের সামগ্রিক জীবনের কথা জানতে হলে, তা উপন্যাসের মাধ্যমেই জানা যায়, যা ঔপন্যাসিকের শিল্পস্বরূপের গুণে মানুষের জীবনে প্রাণবন্ত হয়ে প্রকাশ পায়।

এই প্রসঙ্গে আমরা কবি ও কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে পারি। বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রতবোধ রবীন্দ্রনাথের কাছে বিস্ময়কর বলে বোধ হয়েছে, নিজের দেশের নিরুপায় মানুষের কথা তাঁকে অনেক সময়েই পীড়িত করেছে। সে পীড়ন অসহনীয়। কবির কন্ঠে উচ্চারিত হলো—

"শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।"

এই দুটিমাত্র পংক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মানবপ্রীতির পরিচয় পেয়েছি। এই বোধ রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

২

বাস্তবিক, এই যুগেই আত্মনিরীক্ষা আত্মসংশয়, আত্মপ্রত্যয়ের যুগ সূচিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) যুগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণের ফলে বাংলা উপন্যাসে বৈচিত্র্য-বহুলতা অস্বীকার করার নয়। যৌনসমস্যা এই যুগের আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই যুগের আরেকটি লক্ষণ দেখা যায়—গ্রামীণ জীবনের কাহিনী গ্রথিত করা। চতুর্থ লক্ষণ প্রকাশ পায়—রাজনীতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উপন্যাস রচনা। এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, শিক্ষিত মহল প্রথম মহাযুদ্ধের পর বামপন্থী চেতনায় অর্থাৎ মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণজীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমাজের শ্রেণীস্বার্থ

ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিচার বিশ্লেষণ উপন্যাসের বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হয়। এ যুগের সাহিত্যে সত্য ও বাস্তব (Reality and Real) নিয়ে তর্কের ঝড় ওঠে। কেউ কেউ বলেন—চরিত্রগুলি বাস্তবপ্রধান হবে, আবার কেউ কেউ বললেন—উপন্যাসের চরিত্রগুলি সবসময়েই বাস্তবসম্মত হবে, এমন কোন কথা নয়। তবে D. H. Lawrence উপন্যাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন—The novel is the one bright book of life. কারণ দোষগুণমিশ্রিত মানুষের জীবনের ছবিই হবে উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বিখ্যাত সাহিত্যসমালোচক হাডসন উপন্যাসের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন। সবচেয়ে দুর্গম মানুষের জীবন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিশিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করাই ঔপন্যাসিকের কাজ। মানবজীবন সম্বন্ধে সবিশেষ উপলব্ধি, মানবচরিত্র সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করে সাহিত্যরচনায় এগিয়ে যেতে হবে, নতুবা নয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ অজিত ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"উপন্যাসের বিচারে কেহ আদর্শবাদী, কেহ বা বাস্তববাদী দৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ জীবনবাদী সাহিত্যে বিশ্বাসী, আবার কেহ বা কলাকৈবল্যবাদই দৃঢ়তার সঙ্গে ধরিয়াছেন। কেহ সাহিত্যের বক্তব্য অনুযায়ী সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করেন, এবং কেহ বা রসোত্তীর্ণতার দিক দিয়া তাহার দর যাচাই করেন। কেহ ঘটনা সংস্থাপনার কৌশলের দিকে গুরুত্ব দেন, আবার কেহ বা চরিত্র-সৃষ্টিকেই উপন্যাসের মুখ্য দিক মনে করেন। এমনিভাবে আমরা একই সাহিত্যকে আমাদের নিজস্ব রুচি, প্রবৃত্তি, মতবাদ ও রসবোধ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করিয়া থাকি।"

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা মানুষের প্রতি অবিশ্বাস থেকে, সে যন্ত্রণা জীবনের প্রতি অনীহা থেকে, হৃদয়হীন মস্তিষ্কধর্ম থেকে। ফলে মানুষের মনোজগতে, আধ্যাত্মিক জগতে এক তুমুল তোলপাড় লক্ষ্য করা যায়। আচরণে, ব্যবহারে, সৌজন্যবোধে এক বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়, মানুষ-মনুষ্যের আচরণে এক অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, যা বিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম বলে মনে হয়।

এ সম্পর্কে A. C. Ward-এর বক্তব্য মনে পড়ে। তিনি বলেন—
"No previous generation had shown so close an interest in mental and spiritual disturbance as to create a growing assumption that most men and women are cases to be diagnosed, that the world is a vast clinic and nothing but abnormality is normal.

বিংশ শতাব্দীর এই যন্ত্রণা বা যুগচেতনা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয় বিশ্বসাহিত্যে, বিশেষ কথাসাহিত্যে। ইংরাজী, ফরাসী ও রাশিয়ান সাহিত্য তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সমাজের, রাষ্ট্রের মধ্যে যে ঘুণ ধরেছিল সেই ঘুণধরা সমাজের চিত্র ইউরোপীয়ান সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাটলার, স্টার্ন ও রিচার্ডসনের রচনা, বা টুর্গেনেভ, দস্তেয়ভস্কি ও টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কী প্রমুখের রচনা বা মোপাসাঁ, জোলা, টমাস মান এবং নরওয়ের নুট হামসুনের রচনায় যুগচেতনার চিত্র ধরা পড়ে। 'Modern World Fiction' পুস্তকে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক এবিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেন। অসুস্থ সমাজ-জীবনের ছবি বিস্তৃতভাবে অংকিত হয়েছে এই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের রচনায়। তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, উপরিউক্ত লেখকেরা কেবলমাত্র অসুস্থ সমাজ বা সমাজব্যবস্থার চিত্রলিপি অংকিত করেই কর্তব্য শেষ করেননি, এবং এঁদের অনেকেই নব বাস্তববাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্য, শিবম, সুন্দরের সাধনা করেছেন, যা শাশ্বত, সত্য এবং সুন্দরের।

এই যুগচেতনায় রবীন্দ্রনাথও দগ্ধ। তাঁর লেখার মধ্যে যুগযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে, কিন্তু ভারতীয় জীবনসাধনায় তিনি প্রশান্ত, তাঁর বিদ্রোহ ছিল সবিনীত, তাই তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো,—তাঁর মতে, মহাপাপ। বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বোধ কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে বিস্ময়কর। আধুনিক সভ্যতার রথচক্রতলে সাধারণ মানুষের জীবনের যন্ত্রণা কী যে ভয়াবহ, অপর দিকে

পীড়নকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের ভদ্রজীবন যাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা: বিচারহীন সমাজব্যবস্থার চিত্র, যা এযুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু, তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সুস্পষ্ট। নিঃস্ব, রিক্ত, উপায়হীন মানুষের objective চেহারা ও তার প্রতিকার কিভাবে হতে পারে, তারো ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। আত্মনিরীক্ষায়, আত্মনিষ্ঠায়, মানবসংহতির চেতনায়, বিজ্ঞানের শিক্ষায় অনুশীলিতা হয়ে মানুষ নিজের প্রতি আস্থাশীল হয়েছে। যুদ্ধের উন্মত্ততাকে এড়িয়ে সুস্থ, সুন্দর, পবিত্র জীবনযাপনের জন্য উন্মুখ যে মানুষ সেই মানুষের জয়যাত্রা ঘোষণা করলেন রবীন্দ্রনাথ। বিংশশতাব্দীর এ রূপরেখা তাঁর লেখায় ধরা পড়েছিল। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে শতাব্দীর যুগচেতনা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর এই প্রভাব থেকে রবীন্দ্রভক্ত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও মুক্ত থাকতে পারেন নি। তিনিও এই নবযুগের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন; কথাপ্রসঙ্গে, আলোচনায়, সভাসমিতিতে এবং লেখায় তার দৃষ্টান্ত মেলে। তিনি নিজেও অনেকবার তা স্বীকার করেছেন, অবশ্য তা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ দিয়ে। তিনি বলেন—"বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নরনারীর বহু-মিথ্যা, বহু কুসংস্কার বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে সমাজ কাউকে চায় না। ·· · ···

"এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুষ সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারে।"

বিশ্বসাহিত্যে নিজের স্থান করে নিতে যে সমাজমনস্কতার প্রয়োজন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র সে বিষয়ে সত্যিই সচেতন ছিলেন। এবং আমরা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করবো না যে শরৎচন্দ্র বিশ্বসাহিত্যে নিজের আসন করে নিয়েছেন। মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। "বিদেশের মানবতন্ত্রী কথাকারদের মত (যেমন টলস্টয় গর্কি প্রমুখ) মানুষই ছিল তাঁর রচনার উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের নাগাল হয়তো তিনি ধরতে পারেন নি, হৃদয়সম্পদে এত বড় ধনী লেখক খুব কমই দেখা যায়। আর শরৎচন্দ্রের হৃদয়বৃত্তির আতিশয্যের জন্যেই হয়তো মানুষকে তাঁর সাহিত্যসাধনার চেষ্টায় কিছু উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। কিন্তু তাই কি সব! এই প্রসঙ্গে আমাদের ডিকেন্স ও হার্ডির কথা মনে পড়ে। ডঃ অজিত ঘোষ এ সম্পর্কে সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেন—"হৃদয়াবেগের পূর্ণ প্রাবল্য দেখাইয়াও সাহিত্যকে কিরূপ উচ্চাঙ্গের শিল্পকলায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় ইংরেজী সাহিত্যে তাহার দৃষ্টান্ত হইলেন ডিকেন্স ও হার্ডি। ঐ দুই-জন লেখকের হৃদয়রূপচিত্র সাহিত্যের সঙ্গে শরৎসাহিত্যের অনেকখানি মিল দেখা যায়। শরৎসাহিত্যে হৃদয়াবেগের যে প্রকাশ রহিয়াছে তাহাতে সাধারণত দুর্দম প্রবৃত্তিলীলার উত্তেজনাজনক রূপ নাই, তাহাতে প্রধানত সূক্ষ্ম শান্ত, কোমল অনুভূতির স্নিগ্ধ-করুণ রূপই রহিয়াছে।"

শরৎচন্দ্রের হৃদয়াবেগের দরুন সাহিত্যে যতই দোষত্রুটি থাকুক না কেন, "কিন্তু মানবমনের সুখদুঃখ ও অশ্রুবেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেন নি।" শরৎচন্দ্র মানবতাবাদী ছিলেন। ডিকেন্সের মতই তিনি ভাবপ্রবণ, সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে সচেতন, মানুষের দুঃখবেদনায় অশ্রুসজল। তবে শরৎচন্দ্রের রচনায় বাঙালীর নিজস্ব জীবনরূপ প্রত্যক্ষ হয় শান্ত, ধর্মমুখী, পারিবারিক, স্নেহপ্রীতিমুখর সাধারণ জীবনরূপ। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধে বলেছেন—"শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁহার চরিত্রগুলিকে বাঙালী বলিয়াই তাহাদের মধ্যে সুসঙ্গত প্রবর্তন করিয়াছেন—আধুনিক জীবনের সমস্যাকীর্ণ পথে তাহাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের

ছাড়পত্র দিয়াছেন।"

৩

বিংশ শতাব্দীর সমস্যাসংকুল জীবনযাত্রা, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, বিজ্ঞান-চেতনা দেহজ প্রণয়-আকর্ষণ, সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, যুদ্ধের প্রতি অনাস্থা, প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল, যা শরৎসাহিত্যে বিদ্যমান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জোলা, মোপাসাঁ, দস্তয়েভস্কি, গল্সওয়ার্দি আনাতোল ফ্রান্স, টমাস মান, গোর্কী, স্ট্রিণ্ডবার্গ, হামসুন, জোয়ান বোয়ার প্রমুখ শিল্পীদের জীবনবোধে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি-হিসাবে মানুষের একটা স্বতন্ত্রজগৎ আছে। মানুষের মন ও মনন পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, তা প্রমাণিত। শরৎচন্দ্রের একটা স্বতন্ত্র জগৎ ছিল। সেজন্য নব বাস্তবতায় বিরুদ্ধে লড়াই নয় কিম্বা প্রকৃতি জগৎ নয় কিম্বা বাস্তব জগৎ নয়, এ জগৎ শরৎচন্দ্রের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য, মাটির কাছাকাছি মানুষের জগৎ, স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল আপনার সে জগৎ। যে জগৎ দৈনন্দিন জীবনের রিক্তবিবর্ণ, ভাববাহী জগৎ থেকে মুক্তির জগৎ। সেই মুক্তির জগতে পেঁছানর জন্য স্বপ্নাতুর কিশোর পথে প্রান্তরে হন্যের মত ছুটেছে, ছন্নছাড়া উদাসীন যুবক গ্রামে গ্রামে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, দেশবিদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, মনোবিজ্ঞানীদের লেখা অসংখ্য বই পাঠ করেছেন, জীবনকে আকন্ঠ পান করার জন্য বহু মানুষ-মানুষীর সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করেছেন। সেই জন্যেই "মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা তাঁর রচনার ছত্র ছত্রে ছড়িয়ে আছে। তিনি তার আকৈশোর ভ্রাম্যমাণ বাউন্ডুলে জীবনে বিচিত্র চরিত্রের নরনারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, জীবনের মন্দ দিকটাও বড় কম পরখ করে দেখেন নি।"

শরতের সমাজমনস্কতার আরেকটা হেতু আছে। তিনি যৌবনে ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন টলস্টয়ের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। টলস্টয়ের Ressurrection-এর প্রভাব শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি তার প্রমাণ। ডস্টয়ভস্কি উনিশ শতকে যারা প্রান

(মৃত্যু ১৮৮১)। কিন্তু তাঁর প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপর বর্তেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যাদর্শ সে যুগে কিরূপ ছিল, তা তাঁর "The Brother Karamazov" উপন্যাসের একটি উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র দুর্নিবার ভালবাসাই সত্য, সুন্দরের প্রকাশ সাধনে সহায়তা করতে পারে, ভগবানের সৃষ্ট মানুষকে ভালবাসা—সে পাপীই হোক, আর তাপীই হোক, মানুকে আনন্দ দান করাই হলো সাহিত্যের কাজ। শরৎচন্দ্র তা থেকে মুক্ত নন। টলস্টয়ের ভূমিসংস্কার ও কৃষক উন্নতিচিন্তা তাঁর মনের আনাচে কানাচে উঁকি মেরেছিল। 'মহেশ' গল্পটি দারিদ্র-পীড়িত বুভুক্ষিত, জীবনের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী; গঠনে, আঙ্গিকে, উপস্থাপনায়, একটি মহৎ সৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দ গল্পটি পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। গোর্কীর প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপর যে পড়েনি, এমন কথা বলা যাবে না, যদিও শরৎচন্দ্র মার্কসীয় জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তিনি গোর্কীর মত মুক্তিকামী ও প্রগতিবাদী ছিলেন। গোর্কীর 'মা' যেমন লেখকের সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে প্রচেষ্টার ফসল, ঠিক তেমনি শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ফসল। কংগ্রেসী হয়েও গান্ধী বাদে তাঁর আস্থা ছিল না। তার কারণ শরৎচন্দ্র বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। 'পথের দাবী' উপন্যাসে বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথা আছে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্রের সমর্থন আছে। শরৎচন্দ্র যে মার্কসবাদ পাঠ করেছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর পাণিত্রাসের লাইব্রেরী। সেই ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে মার্কস ও লেনিনের কতিপয় পুস্তক সংগৃহীত ছিল। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদ ও রুশ বিপ্লব সংক্রান্ত কয়েকখানি বই-পুস্তকও ছিল। রাশিয়ার প্রভাব 'পথেরদাবী' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী ভারতীকে যখন বলেন, জনকতক কুলিমজুরের ভাল করার জন্য এ সংগঠন তিনি সৃষ্টি করেননি, আসল উদ্দেশ্য স্বাধীনতা। সব্যসাচী বলেন— 'শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিগরের মাঝখানে, কারখানায়, ব্যারাকে, কিন্তু পাবে খুঁজে পাড়া-গাঁয়ের চাষার কুটীরে'। সব্যসাচীর উক্তি থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে

সর্বহারা শ্রমিকরাই দেশের আসল শক্তি।

'পথের দাবী' উপন্যাসে অন্যতম বিপ্লবী চরিত্র রামদাস তলোয়ারকর। তাঁর বক্তৃতায় শ্রমিক-মজুর-কৃষক সংহতির আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, আবার একটা প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতের কথা উচ্চারিত হয়েছে। তাতেই মনে হয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। কৃষক-সমাজের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী 'মহেশ' গল্পে পেয়েছি, কৃষক-সমাজের প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যাবে তাঁর অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'জাগরণ'-এ। মনে হয়, এ সমস্তই রুশ সাহিত্য পাঠের ফলাফল। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের বহুসমালোচিত উপন্যাস। অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত। শরৎচন্দ্র খেদের সঙ্গে ঋষি টলস্টয়ের প্রসিদ্ধ উপন্যাস রিসারেকশনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন বন্ধুকে। Resurrection উপন্যাসে এক অভিজাত ব্যক্তির সন্তান কন্যাকে অপহরণ ও পরিত্যাগের কাহিনীকে অবলম্বন করে দেহজ কামনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, নিজের কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা একটি পত্রে লেখেন যে, 'টলস্টয়ের রেজারেকসন পড়েছ কি? His best book একটা সাধারণ বেশ্যাকে নিয়ে।' অর্থাৎ পতিতার জীবনের কাহিনী আছে তারাও রক্তে মাংসে গড়া নারী, সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার অংশীদার। মানবস্বভাবের নিজস্ব নীতি ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে শরৎচন্দ্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি; সাহিত্যের সত্যকে তিনি বরণ করে নিয়েছেন। সামাজিক নীতি-শাসনের কৃত্রিমতাকে strictly moral বলতে চাননি। 'চরিত্রহীন'-এ দুটি চরিত্র—কিরণময়ী ও সাবিত্রী। কিরণময়ী সমাজের অনুশাসনকে মেনে নিতে পারেনি, প্রচলিত শাস্ত্রের বুলিকে পাত্তা দেয় নি, সতীত্বের প্রতি তার আদৌ আস্থা নেই, কিন্তু জীবনদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু কেন? এখানেই শিল্পীর জয়। strictly moral অন্যদিকে সাবিত্রী। একটি মেসের ঝি, লম্পট ভগ্নীপতির পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গিয়েছিল। ভগ্নীপতি তাকে বিয়ে করবে বলে বাড়ী থেকে ফুসলে নিয়ে আসে এবং পরে ত্যাগ করে। হয়তো পরিবেশের জন্য সাবিত্রী নিজের দেহকে পবিত্র রাখতে

পারেন নি, তথাপি তার সংহত, সংযত, সর্বংসহা মূর্তিটি আমাদের ভুলবার নয় কারণ সে নিজেকে তিল তিল করে খুইয়ে মাতাল সতীশের জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র যে কত বড় শিল্পী তা তাঁর শিল্পচেতনার গুণে প্রমাণিত হয়। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স যে দরদ ও আবেগ নিয়ে 'এ টেল অফ টু সিটিস' (A Tale of Two Cities) উপন্যাসে মাতাল অথচ মহৎ সিডনি কার্টনের অনুপম চরিত্রটি এঁকেছেন ঐরূপ দরদে ও আবেগে হীন পরিবেশের চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ডিকেন্সভক্ত শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকারা মাতাল কিংবা পতিতা হলেও মহৎ। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক আরেকজন রাশিয়ান সাহিত্যিক আলেকজান্দার কুপরিনের কথা (১৮৭০-১৯৩৮)। গণিকজীবনের যে বাস্তবচিত্র তিনি সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন Yama the Pit উপন্যাসে। কুপরিনের দৃষ্টি ছিল শরৎচন্দ্রের মতই আবেগপ্রবণ ও সমবেদনাপূর্ণ। তাঁর 'ইয়ামা উপন্যাসে পতিতা চরিত্রগুলির ভালমন্দ সব দিক খুঁটিয়ে দেখবার যে চেষ্টা আছে, বাঙালী সামাজিক লেখক শরৎচন্দ্র ঠিক অনুরূপ চেষ্টা করেন নি; পক্ষান্তরে মনুষ্যত্ব বা মানসিক দিকগুলি অধিক উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। এখানেই শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। সমাজজীবনের বাসভূমিতে যে দুঃসহ গ্লানি ও পঙ্কিলতা পুঞ্জীভূত; কিংবা দেহগত ভোগলালসার ছবি তিনি অঙ্কিত করেননি, তিনি চেয়েছিলেন 'সমাজের অনাচার এবং অবিচারের রথচক্রতলে পিষ্ট মানব-মানবীর মর্মন্তুদ কাহিনী লিখে সমাজের শিষ্ট ও শিক্ষিত স্তরে প্রচণ্ড আঘাত দিতে। এই অর্থে শরৎচন্দ্র নিশ্চয় নীতিবাদী বা পিউরিটান। কিন্তু তাই বলে তাঁর রচনাকে যদি অশ্লীলতা বলে নাক-সিঁটকানো হয় তাহলে অন্যায় হবে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যটি সবচাইতে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"মানুষের অন্তরতম যে আকাঙ্ক্ষা নীড় বাঁধিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা মূঢ়তা। ···মানুষের শ্রান্তি দুর্বলতার জন্য তাঁহার অফুরন্ত দরদ।" যদি নীতিবাগীশ puritanগণ এই মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদকে

অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত করেন, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ শরৎচন্দ্র নিজেই ছিলেন একজন puritan.

শরৎচন্দ্র সচেতন শিল্পী ছিলেন। নানাগ্রন্থ অনুশীলন করে শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন সর্বযুগে এবং সর্বদেশে শক্তিশালী পুরুষ দুর্বল নারীকে কোন স্বাতন্ত্র্য দিতে চায়নি। সর্বকালেই দুর্বল নারী সবল পুরুষের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের নারীবিদ্রোহ সেই কারণেই।

কিরণময়ীর কথাবার্তায় স্পেন্সারের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে কারণ শরৎচন্দ্র স্পেন্সারের বিবর্তনবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। কিরণময়ী যখন বলেন—'আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি, যখন কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি। কিরণময়ী বিকারগ্রস্থ একজন নারী, জৈবাবেগ ও কামচেতনা দ্বারা জর্জরিত, মনে হয় বাইরে থেকে অদ্ভুত, কিন্তু বাস্তব। শরৎচন্দ্রের গভীর অন্তরদৃষ্টি ঠিক দস্তয়ভস্কির মত। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের যে প্রশ্নগুলি উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের মুখে ব্যক্ত হয়েছে, সেখানে স্পেন্সারের অধিকারের প্রশ্নগুলি একান্তভাবে সম্পৃক্ত। শরৎচন্দ্রের বেদনা-বোধ সেই সমস্ত নর-নারীর জন্যে, যারা মুহূর্তের ভুলে সব হারিয়েছে, যাদের হৃদয়কে কেউ দেখতে পায় না। মানুষ-মানুষীর মূল হৃদয়সত্তাকে বিচার করাই হয়তো সাহিত্যিকের কাজ। শরৎচন্দ্র তাই করেছিলেন। ড সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়—"He seems to ave judged men and women by an original standard, a man is not great or good if he merely conforms to accepted standards but he is truly heroic, if he has a broad outlook and a sensitive heart."

বাংলা সাহিত্যে সমসাময়িক যুগে রুশসাহিত্যের ন্যায় ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। জোলা, মোপাসাঁ, ফ্লবের ফরাসী সমাজের কদাকার বাস্তব চিত্র বাংলা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। অন্যতম ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস ধর্মান্ধতা, সামাজিক অনাচার ও রাজনীতির কারসাজির চিত্র

সাহিত্যে অবতারণা করেছিলেন।. ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ— যিনি ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন, তাঁর প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপর পড়েছিল। তিনি শরৎসাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। রোমাঁ রোলাঁর অন্যতম মহৎ উপন্যাস—'জাঁ ক্রিস্তফ'। রোলাঁর নিজস্ব চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম মহৎ উপন্যাস—'শ্রীকান্ত'। শ্রীকান্তের সঙ্গে 'জাঁ ক্রিস্তফ' -এর বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে। 'শ্রীকান্তের' ইতালীয় অনুবাদ পাঠ করে তিনি শরৎচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলে মনে করতেন। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এর বিশালতা, পরিধি, অসাধারণ বৈচিত্র্যমণ্ডিত এবং অনাগত নরনারীর আশ্চর্য প্রাণের সমাগম লক্ষিত হয় রোমাঁ রোলাঁর— Jean Christopher উপন্যাসের মতো। 'শ্রীকান্তের' সমগোত্রীয় আরো কয়েকটি দীর্ঘ উপন্যাসের পরিচয় আমরা পাই। টমাস মানের 'Buddenbrooks', 'The Magic Mountain', রেমেন্টের 'Peasants' অধ্যাপক ও সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তার বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন—

—"শ্রীকান্ত উপন্যাসের কাহিনী অসাধারণ বৈচিত্র্যমণ্ডিত এবং অগণিত নরনারী ইহাতে ভীড় করিয়াছে। ইহারা নিজেদের প্রয়োজনে আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে, কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক নাই। বর্তমানকালের দীর্ঘ উপন্যাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। রোমাঁ রোলাঁর Jean Christopher, Buddenbrooks, The Magic Mountain, ও রেমন্টের Peasants প্রভৃতির কথা সকলেরই মনে আসিবে। শুধু পরিধির বিশালতা দিয়া বিচার করিতে গেলেও শ্রীকান্তের তুলনা বিরল। অথচ পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার মূলসূত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, কোন একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বা কোন একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই।"

শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক একজন প্রতিভাধর জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান। সমাজবাদী পূর্ব জার্মানি ও ধনতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানির মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লেখক। 'বুডেনব্রুকস ও ম্যাজিক মাউন্টেন' এই দুটি

উপন্যাসই বিশাল। প্রথমটি প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের গতি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে—'এ নভেল অ্যাজ অ্যান আরকিটেকচার অফ আইডিয়াজ।' মানের আত্মজীবনীমূলক প্রথম অসামান্য উপন্যাস 'বুডেনব্রুকস'-এ খুঁজে পাওয়া যাবে দুটি দিক—তাঁর প্রবল বাস্তবতামুখী ও প্রবল কল্পনাপ্রবণ জীবনযাত্রা। সে পথে প্রান্তে দেখা যাবে ইউরোপীয় ক্যাথিড্রাল কিংবা দক্ষিণভারতের আকাশচুম্বী মন্দির, যার চত্বরে ভিড় করে রাজা, মহারাজা, জমিদার, চাষী, ভিখিরী। একদিকে যেমন সংবেদনশীল, অপরদিকে আত্মজিজ্ঞাসায় তীব্রতর। 'বুডেনব্রুকস ও ম্যাজিক মাউণ্টেন' যেমন একই অসাধারণ কল্পনা ও বাস্তব দৃষ্টিতে ঐশ্বর্যবান মানুষটির (টমাসমান) ছায়াপথ, 'শ্রীকান্ত' দরদী শরৎচন্দ্রের ছায়াপথ। শিল্পীর কৈশোর, যৌবন, ও বার্ধক্যের অনেক ঘটনা 'শ্রীকান্তের' বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে মিল আছে। "শুধু কেবল বাইরের ঘটনা ও চরিত্রের দিক দিয়েই যে শ্রীকান্তের কাহিনীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবন-কাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে তা নয়, মানসিকতা, জীবনবোধ ও সমাজভাবনার দিক দিয়ে বিচার করলেও শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্রকে একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। শ্রীকান্ত সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যে শ্রীকান্ত-সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তা নয়, তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকেই শ্রীকান্ত-সত্তার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন।"

ডিকেন্সের লেখায় অসৎ মানুষের সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায়। তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসে তাঁরই মত নিপীড়িত, অত্যাচারিত, অসহায়, উপায়হীন শিশুকে দেখতে পাই। 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর 'ডেভিড' এরূপ একটি চরিত্র। শিশুর দেখা জগৎ বয়স্কের দেখা জগৎ থেকে কম সত্য নয়। ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' তারই দৃষ্টান্ত। বঞ্চিত ডিকেন্স আশৈশব। ডিকেন্সের বাস্তবতার ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মজীবনীমূলক অন্যতম উপন্যাস—'ডেভিড কপারফিল্ড'। শৈশবে ডিকেন্সকে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে হয়েছে। স্বপ্নাতুর ডিকেন্সের কৈশোরের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। ঠিক যেমন মাত্র দশ টাকার জন্য কিশোর শরৎ-চন্দ্রের পরীক্ষায় বসা হয়নি, বর্ণাশ্রমভেদী সমাজের চাপে একঘরে হয়ে বাস করতে হয়েছে, তার পক্ষে realism কে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক।

ডিকেন্সের লেখায় যেমন পাওয়া যায় অনাচারের প্রতি নির্মম প্রতিবাদ সেই যুগের শিল্পবিপ্লব জর্জরিত রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে সেই প্রতিবাদ। শরৎচন্দ্র বর্ণাশ্রমভেদী বাঙালী হিন্দুসমাজের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ওপর আঘাত হেনেছেন। অভয়ার যে বিদ্রোহ, কমলের মত্যে অকপট নারী, যে নিজের জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না, কিংবা অন্নদাদিদির মতো নারী যে কুলের মোহ অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে—তা একমাত্র বাঙলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির দর্পণে প্রতিভাত হয়েছে। সেই কারণেই তিনি ডিকেন্স-এর সহমর্মী ও সহধর্মী। "আর যে সব ইউরোপীয় সমসাময়িক সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিলেন তাঁহারা হইলেন বোয়ার ও হামসুন। বোয়ারের 'Great Hunger' একখানি বহুপঠিত উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক হামসুনের 'Hunger'-এর মধ্যে তাহার দারিদ্র্যপীড়িত, বুভুক্ষিত জীবন-কাহিনীই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের মতই হামসুন ছিলেন শ্রী ও ছন্দহীন, ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া। দুইজনের মানসভঙ্গির মধ্যেও ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।" বোয়ার ও হামসুন নরওয়ের অতিবাস্তবাদী সাহিত্যিক ছিলেন।

ফরাসী সাহিত্যিক জোলার সহধর্মী শরৎচন্দ্র। জোলার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রেঙ্গুনে থাকাকালীন কতকগুলি অসহায়, উপায়হীন, বঞ্চিত, দুর্বল নর-নারীর সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। মদখোর পুরুষ, বেশ্যানারী, দরিদ্র মজুরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই সমস্ত নরনারীর হৃদয়-বেদনা শরৎচন্দ্রকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। জোলা জগৎকে দেখতে গিয়ে হাসপাতাল দেখিয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মধ্যে চোর, জুয়াচোর, মাতাল, বেশ্যা, যেমন একদিকে স্থান পেয়েছে, ঠিক অপর দিকে দরিদ্র মজুর-শ্রেণীর দুঃখ, দৈন্য, হতাশা, যন্ত্রণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি মানুষকে ভালবাসার জন্য সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যে জোলার প্রত্যক্ষ বাস্তববাদ সমকালীন ও পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে, তাঁর Naturalism ও Realism—এই দুটি ধারাই শরৎসাহিত্যে পরিলক্ষিত

হয়।

আর একজন শ্রেষ্ঠ ফরাসী সাহিত্যিক হ'লেন আনাতোল ফ্রান্স। ধর্মীয় অন্যায়, সামাজিক অবিচার ও ভণ্ডামি তিনি নির্মমভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে তুলে ধরেন। 'মহেশ' গল্পের তর্করত্ন মহাশয়ের ও 'দত্তা' উপন্যাসের রাসবিহারী চরিত্রে ভণ্ডামির চিত্র পাই। বিংশশতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতার দরুণ যেভাবে গফুরকে সাতপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, তা সত্যিই অবিচার।

"ইংরেজী সাহিত্যের শ, গলসওয়ার্দি ও এচ্. জি. ওয়েলস ছিলেন সমসাময়িক বহুপঠিত ও বহু আলোচিত লেখক। ইহাদের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ছিলেন বার্ণাড্ শ। বার্ণাড্ শ-এর বৈপ্লবিক সমাজচিন্তা তখন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ণ সৃষ্টি করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র যে অন্তত 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে শ-এর বৈপ্লবিক সমাজচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

'শেষপ্রশ্ন' পাঠ করার পর মনে হয় শরৎচন্দ্র লেখা একটি চিঠির কথা। 'পড়িয়াছি বিস্তর, প্রায় কিছুই লিখি নাই।' কারণ 'শেষপ্রশ্নে' যে প্রশ্ন তা বিশ্বদর্শন, সমাজনীতির প্রশ্ন। কমল-এর চরিত্রে, ব্যক্তির যুক্তিতে তারই প্রকাশ। স্পেন্সার মার্কস এর যুক্তিবাদ, অন্যদিকে সক্রেটিসের সোফিস্টবাদের মিলন ঘটেছে। নীলিমা কমলের প্রসঙ্গে বলেছিল,—"স্বাধীনতা তত্ত্ববিচারে মেলে না, ন্যায়ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না,...কমলকে দেখলেই দেখা যায় এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে।" শরৎচন্দ্রেরই পঠনপাঠনের দার্শনিক উক্তি যা কমলের মুখে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর সত্ত্বকে প্রতিপন্ন বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কমলের যুক্তি, যা হৃদয়হীন। বার্ণাড শ এর মত সাহিত্যপ্রচার নীতির প্রবেশে বিশ্বাসী। শ নাট্যকার ছিলেন, নাটকের মাধ্যমে জনমত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সমস্যাভিত্তিক উপন্যাসে এই প্রচার ধর্মিতার সম্ভাবনা কম তবু গোলক চাটুজ্জে বা বেণী ঘোষালের মত হীন সমাজপতির বা শক্তিমান সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তির হীনতা হতে সমাজের মুক্তি অবশ্য কাম্য এই ভাবসত্য 'বামুনের মেয়ে',

'পল্লীসমাজ', 'দেনা-পাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসে উপস্থিত করা হয়েছে। 'শেষপ্রশ্নে' কমলের মুখে সামাজিক সমস্যার কথা, সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের সঙ্গে খ্যাতিমান রুশ লেখক 'রুদিন' (Rudin) উপন্যাসের রুদিন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। কমল ও রুদিন (Rudin) চিন্তা-ভাবনায়, যুক্তিতে, বাগ্‌বৈদগ্ধে আধুনিকা এবং তর্কপ্রিয়। রাশিয়ার সাহিত্যের প্রভাব শরৎসাহিত্যে কি হারে অনুপ্রবেশ করেছিল, তার প্রমাণ কমল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়ার আবেগ প্রবণ বুদ্ধিজীবী মনের ব্যর্থতা 'রুদিনের' মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। ঠিক কমলও যেন শরৎচন্দ্রের নায়িকা নারী নয়, সেও যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তর্কপ্রিয়, সংগঠনহীন, চঞ্চল বাঙালী বুদ্ধিজীবী শাসনের প্রতীক।

হার্ডি'রও প্রভাব শরৎচন্দ্রের মধ্যে লক্ষিত হয়। হার্ডি মূলত কবি, তথাপি গ্রাম্য কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণনায় তাঁর সমকক্ষ সমকালীন লেখকের কেউ ছিল কিনা সন্দেহ আছে। শরৎচন্দ্রের মতো তিনিও গ্রামের লোক। গ্রামকে ভালবেসেছিলেন, গ্রামের মানুষকে ভালবেসেছিলেন। চিন্তাশীলতায় তিনি প্রগতিশীল যদিও তিনি ছিলেন খৃষ্টান, যেমন শরৎচন্দ্রও মনেপ্রাণে প্রগতিপন্থী, চিন্তায় ভাবনায় সনাতনপন্থী, হার্ডি'র 'Jude the Obscure' উপন্যাসে জুড্ দেহগত কামনা-বাসনায় অস্থির, জীবনের অবচেতন মনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য কোন এক মুহূর্তে সে মদ্যপানকে আশ্রয় করে, যেমন কিরণময়ী নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য দিবাকরের আশ্রয় নেয়। সদ্য নতুন যুগের নারী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিবৃত্তিতে কিরণময়ী অভয়া, কমল, সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা চলে।

৪

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি, মানস গঠন, চিন্তার গভীরতা, উদার মানবতাবোধ, প্রচণ্ড অধ্যবসায় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে আমরা বিশ্বের কয়েকজন সাহিত্যিকদের জীবনবোধের সাদৃশ্য খুঁজতে চেয়েছিমাত্র ; কারো সঙ্গে তুলনা করা নয়। কারণ শরৎচন্দ্র—শরৎচন্দ্রই। জীবনবোধ অনন্য এবং একক। হৃদয়সম্পদে পৃথিবীর যে কোন মহান কবি ও সাহিত্যিকদের মত ধনবান।

কবি-অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু যদিও বলেছেন — "No other Bengali author, not Rabindranath himself, has Saratchandra's measure of immediate success. Like Dickens he was the idol of his public. A heart-charmer he has been, a heart-charmer he will always be."

বাস্তবিক তাই, তিনি সাধারণ মানুষের হৃদয়রঞ্জন, সর্বকালের মানুষের হৃদয়রঞ্জন। আত্মার আত্মীয়।

বাংলার পল্লীসমাজের ভাষ্যকার

'সত্যের স্থান মুখের মধ্যে নয়, বুকের মধ্যে'—শরৎচন্দ্রের রচনায় ও অনুভাবনায় তারই প্রকাশ। অন্তরের দরদ, হৃদয়ের অনুভূতি তাঁর পল্লীভিত্তিক রচনায় অকৃত্রিম ও অনবদ্য। শরৎচন্দ্রের চিত্রিত বাংলার গ্রাম ও গ্রামের মানুষ—'যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই' তারা মনে হয় সকলে খুবই কাছের মানুষ, পরিচিত সুজন, স্বজন। পল্লীবাংলার এমন বাস্তব-রূপ — সুখে দুঃখে প্রেমে দ্বন্দ্বে, ভালয় মন্দে, সংকীর্ণতা ও প্রসান্নতার যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সনাতন গ্রাম-বাংলার মানুষের মমতা, সহৃদয়তা, সেবাপরায়ণতা, উদারতা প্রভৃতি গুণগুলি সুস্পষ্ট। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, সংস্কারান্ধ, নানাবিধ কুসংস্কারে জর্জরিত, আচার আচরণের গোঁড়ামীতে ভণ্ড অজ পাড়াগাঁর চিত্র পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। নারী চরিত্রের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি ও করুণায় পাঠকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কত বিচিত্র মানুষের মিছিল চলেছে তাঁর রচনায়। সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীল বদ্ধ পরিবেশে শরৎচন্দ্র যে সমস্ত নরনারীর চরিত্র গেঁথেছেন. তারা দোষগুণে রক্তমাংসের মানুষ। বাস্তবের মাটি দিয়ে জীবন্ত মানুষ গড়ার মত তাঁর জীবনবোধ, পর্যবেক্ষণশক্তি অভিজ্ঞতা অনস্বীকার্য। বিশেষত, গ্রামীণ পরিবেশে রচিত পল্লীসমাজ (১৯১৬). নিষ্কৃতি (১৯১৭), পণ্ডিত মশাই (১৯১৪), শুভদা, বিরাজবৌ (১৯১৪), অরক্ষনীয়া, দেবদাস (১৯১৭), শ্রীকান্ত (১৯১৮) প্রভৃতি উপন্যাসগুলিই তাঁর শিল্পকীর্ত্তির পরীক্ষিত নিদর্শন। অন্ততঃ শরৎ-জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। শরৎচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই সমাজের কাছে অনাদরনীয়। তিরস্কার, ভৎর্সনা, উপদেশ ছাড়া ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। কিন্তু আশৈশব তিনি ব্রাহ্মণ শাসিত পল্লীসমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। সমাজে যারা ঘৃণিত— বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মেলামেশা করেছেন। যাত্রার দলে. সাপুড়েদের দলে, একান্তভাবে ভিড়েছেন। বাগদি-পল্লীতে বসন্ত মহামারীতে মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে সংকোচবোধ করেননি।

ম্যালেরিয়া জ্বরে অচৈতন্য হয়ে বাউরীদের ঘরে থাকতে হয়েছে। সম্ভবতঃ নানা কারণে নারী চরিত্রগুলিতে যেমন সিদ্ধেশ্বরী (নিষ্কৃতি), রমা ও জ্যাঠাইমা (পল্লীসমাজ), কুসুম (পণ্ডিত মশাই), মৃণাল (গৃহদাহ), হেমাঙ্গিনী (মেজদিদি) প্রমুখ নারীর মাধুর্য, সহনশীলতা, সেবা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ, মহানুভবতা লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, তাঁর রমেশ, ইন্দ্রনাথ, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, বিপ্রদাস, রমেশ, সুরেশ, শ্রীকান্ত স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। শিল্পীমনের মাধুর্য দিয়ে এইসব আপাততুচ্ছাতিতুচ্ছ চরিত্রাবলীর চিত্রমালা রচনা করেছেন। তিনিই প্রকৃত শিল্পী যিনি অপরিসীম মমত্বে মধ্য ও নিম্নবিত্ত হিন্দু মুসলমান সমাজভুক্ত কৃষক সমস্যার প্রত্যক্ষ চিত্রায়ণ করেছেন। বিশেষত, তাঁর গল্পে, উপন্যাসে ছড়ানো ছিটানো চাষী জীবনের যে সমস্ত চিত্র লক্ষ্য করা যায়, তা কৃষক-সমাজের সনাতন দুঃখকষ্টের প্রতিবিম্বন। তিনি অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, গ্রামেই লালিত পালিত। পল্লীসমাজের মানুষের জীবনযাত্রা, অভাব-অভিযোগ, সুখদুঃখ, ধ্যান-ধারণা, রুচি-অরুচি প্রভৃতির সঙ্গে মেলামেশার সূত্রে পরিচিত ছিলেন। যিনি জীবন সত্যের অনুসন্ধানে দেশ হতে দেশান্তরে, মত হতে মতান্তরে, স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ করেছেন, তিনি মানুষের আত্মার অপমান করেননি। হিন্দু সমাজপতি শ্রেণীর প্রতিভূ ব্রাহ্মণের ক্রূরতা, তেমনি অপরদিকে নিপীড়িত, শোষিত প্রোলোতারিয়েত এর পাশে দাঁড়িয়ে অবলা পশুর আর্ত্তনাদ শুনেছেন। শিল্পীর সার্থকতা এইখানেই। কেবল নির্যাতিত মানুষ নয় পশুর প্রতিও তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম। নাহলে কি হাওড়া জেলা পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতির তিনি সভাপতি হন! যে যুগে সংস্কৃতি সেবিগণ রাজনীতিকে কুষ্ঠের মত ছোঁয়াচে বলে দূরে সরে থাকতেন, সেই সময়ে তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সমকালীন লেখকদের থেকে শরৎসাহিত্যে জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ লক্ষনীয়। অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যস্ততায় তিনি সাহিত্য সাধনা থেকে সাময়িক বিচ্যুত হন। ভারতের পটভূমিকায় বাংলাদেশ ও বাঙালীর উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব সুদূরে প্রসারিত। তিনি বলে-

ছিলেন "আমি বলেছি বারদোলি নয়, মেদিনীপুরের কৃষকরাই আইন অমান্যের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তৈরী যেদিন ভারতের স্বাধীনতার জন্য life and death struggle আরম্ভ হবে, আমি বলছি তোমরা দেখ, সে সময়ে নিশ্চয়ই lead করবে বাঙালী। আমার একথা ফলবে, ফলবে, ফলবে, কিছুতেই এর অন্যথা হবে না।' আশ্চর্য 'জাগরণ' উপন্যাসে অমরনাথ বা অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কৃষক সাংগঠনিক শক্তির সম্ভাব্য আভাস মেলে। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ না থাকলে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ধাঙড় সংগঠনে এগিয়ে আসতেন না। 'মহেশ' গল্পের গফুর, পল্লীসমাজের আকবর আলি লাঠিয়াল, 'দেনাপাওনার' সাগরসর্দার কিংবা হরিহর সর্দার প্রমুখ ভূমিহীন ও অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর শৈল্পিক সত্তা অনন্য সাধারণ। বাংলার মুসলমান সমাজ বলতে চাষী সমাজের একটি বিরাট অংশ। চাষী সমাজের স্বরূপচিত্রণ তাঁর রচনায় স্বল্প। তবু চাষীজীবনের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা ছিল না।

শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী কথাবিদ। স্বাভাবিক, বাস্তববাদকে তিনি পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে সাগর সর্দার ভূমিহীন চাষী সম্প্রদায়ের লোক। এককালে এই সম্প্রদায় গৃহস্থ কৃষক ছিল, কিন্তু এখন ভূমিহীন। ক্ষেত মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। জোতদারের অত্যাচারে বঞ্চিত, সর্বহারা অনুরূপ 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশের কৃষক উপচিকীর্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। চাষীরা রমেশকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। গ্রামের মানুষের সেবায় আদর্শবাদী রমেশ নুরপুরের চাষীদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করে, স্কুল তৈরী করে দেয়, চাষীদের নিয়ে বৈঠক করে। অপর-পক্ষে, বেণী ঘোষাল হিন্দু ভদ্রলোক, জোতদার শ্রেণীর মানুষদের প্রতিভূ। একশ বিঘার জমির ধান রক্ষার জন্য বাঁধের মুখ খুলে দেওয়ার জন্য রমেশ চাষীদের হয়ে বেণীকে অনুরোধ-উপরোধ করে। কিন্তু ধূর্ত বেণী ঘোষাল রাজী হয় না। 'পল্লীসমাজে'র মুসলমান চাষীর সঙ্গে হিন্দু জোতদারের যে পার্থক্য দেখিয়েছেন তা খুবই ইঙ্গিতবহ।

শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে শরৎচন্দ্রের গ্রামভিত্তিক উপন্যাসগুলির উৎকর্ষতা বেশী। কারণ শরৎচন্দ্রের আজীবন গ্রামজীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। কৈশোরে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি দিয়ে যে গ্রাম তিনি দেখেছিলেন, তাঁর স্মৃতি অবিস্মরণীয়। আমৃত্যু তিনি সেই স্মৃতি বুকের মধ্যে পোষণ করেছিলেন। তিনি রক্ষণশীল ছিলেন। গ্রামীণ সংস্কারের মধ্যে যে দুর্বলতা বিদ্যমান, তা থেকে তিনি রেহাই পাননি। বহুবালের ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতবিচার, গোঁড়ামী ব্রাহ্মণ, সংস্কার তাঁর চিন্তাধারাকে অক্টোপাশের মতো ঘিরে রেখেছিল। মানুষটি ছিলেন মজ্জাগতভাবে গ্রামীণ ও মানবপ্রেমিক। গ্রামজীবনের কোন্দল, দলাদলি, মামলা মোকদ্দমা, কূপমণ্ডক জীবনযাত্রার মধ্যে পারিবারিক জীবনের দুঃখকষ্টের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর নগর কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি যেমন শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শেষপ্রশ্ন, প্রভৃতিতে যে বুদ্ধিদীপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু পাঠক-সমাজ সর্বাঙ্গীণ অভিনন্দন জানিয়েছে—পল্লীসমাজ, বিরাজ বৌ, নিষ্কৃতি, বড়দিদি, মেজদিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, অরক্ষনীয়া, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, রামের সুমতি, বামুনের মেয়ে, একাদশী বৈরাগী প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্প-গুলিকে। মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, ও একাদশী বৈরাগী—গল্পগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের সম্পদ। কারণ, এই রচনাগুলির গঠনকৌশল, চরিত্রগ্রন্থনা ও প্লট সুগঠিত ও অতি পরিচিত। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে কৈলাস বুড়ো চরিত্রটি অনবদ্য। এই আত্মভোলা প্রাণবন্ত মানুষটিকে কে না ভালোবাসে? 'দেবদাস' যতই মেলোড্রামার লক্ষণে চিহ্নিত হোক না কেন, ভাগ্যাহত দেবদাসের জন্যে পাঠকের করুণার উদ্রেক না করে পারে না।

বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিবহনকারী বালবিধবা রমার ভালবাসা, রিক্ত পরিবারের বয়স্থা অনূঢ়াকন্যা জ্ঞানদার বুকফাটা যন্ত্রণা, অভিমানিনী বিন্দুর সন্তান বাৎসল্যের ক্ষুধা ও বন্ধ্যা নারীর অপরিপূর্ণতা, বোম্বেটে বেহেড্ গুলিখোর স্বামীর সতী সাধ্বী স্ত্রী শুভদার ঔদার্য, কল্পিত কলংকিত মায়ের জন্যে কুসুমের হৃদয় শৈথিল্য, কিংবা স্বামী নামক পুরুষের প্রতি নিবেদিতা অচলার অন্তর্দন্দ্বের মধ্যে শাশ্বত কালের বাঙালী গ্রাম্য

নারীদের মর্মন্তুদ জীবনবেদ রচনা করেছেন শিল্পী তাঁর নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে। গ্রাম-জীবনের বিচিত্র নরনারীর সংস্রবে আসেন শরৎচন্দ্র। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলন ঘটে। রাধারানী দেবীকে একটি পত্রে লেখেন— "নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি, এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয়তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারাংবার, আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধ হয় এত সহজে ছোটবড় সবাইবার কাছে আবেদন পেয়েছে।"

দুই

কিন্তু শরৎচন্দ্রের গ্রাম্যসমাজ মান্ধাতার আমলের আদিকাল থেকে একই জায়গায় পাষাণের মতো বসে থাকবে? এই অচলায়তন সমাজ কি কোনদিন নড়বে না? ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে যুগে বিপ্লব ঘটে গেছে পৃথিবীতে, বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে জনগণের মনকে তৈরী করে দিয়েছে সাহিত্য - ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার বিপ্লব, জার্মাণজাতির উত্থান তার প্রমাণ। কিন্তু ভারতবর্ষে— ? বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত নবজাগরণের যুগে গ্রাম্যসমাজ কি একই জায়গায় বসে থাকবে? প্রসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধেয় চার্লস মেটকাফের-এর বহুল প্রচারিত উক্তির কথা মনে পড়ে— 'Dynasty aftar dynasty trumbles down, revolution succeeds revolution; Hindu, pathan, Mogul, Sikh, English are masters in turn; but the village community remains the same'.

বাস্তবিক, আশ্চর্যের ব্যাপার শরৎচন্দ্রের সংবেদনশীলতা কোথাও সামাজিক অনুশাসনের বেড়ার বাইরে যায়নি, বহুকালের নীতিবোধ ঊনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে বাঙালীর চেতনাকে আছন্ন করে রেখেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র কেউই সেই সামাজিক অনুশাসনের বাইরে যেতে পারেননি। শরৎচন্দ্র কুশলী শিল্পী। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে

অবলম্বন করে সমাজের মাটিকে আঁকড়ে ধরেছেন। তাঁর রচনায় মানুষকে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবেই অঙ্কিত করেছেন, পল্লীসমাজের দলাদলি ও স্বার্থবুদ্ধির নিন্দা করেছেন, কিন্তু পল্লীসমাজকে ভেঙে ফেলতে পারেননি। বৃহত্তর পৃথিবীর কোন আলোই গ্রামীণ সমাজে প্রবেশ করতে পারেনি, এমনকি স্বদেশী আন্দোলনের কতটুকু কল্লোল নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনকে উজ্জীবিত করেছে ? তাঁর রচনায় মননশীলতার ঔজ্জ্বল্য রয়েছে, প্রগতিশীল চিন্তার খোরাক আছে, বিদ্রোহ আছে আদর্শের চমকপ্রদ ভাষা আছে, কিন্তু সামাজিক ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত ছিল না। "কুলীন ব্রাহ্মণের মজ্জাগত চিত্ত সংকীর্ণতার উর্ধে ওঠা তার মত স্বভাব-দরদী শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয় নি।" তিনি কিছুটা সাম্প্রদায়িক ভুক্ত ছিলেন, তাঁর ব্রাহ্ম-বিদ্বেষও প্রকট। 'গৃহদাহ' 'দত্তা' উপন্যাসদ্বয়ে তার প্রমাণ মেলে ! সনাতন ধ্যান-ধারণাই কমবেশী শরৎ সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তারলাভ করেছে। একজন প্রখ্যাত সমালোচকের মতে— "মহৎ উপন্যাসের প্রকৃতিগত উপাদানের শোচনীয় অভাব লক্ষ্য করা যায়। সুবিপুল মানব-সমাজ সুদূরগত মানবসভ্যতা—বিশাল পটভূমিতে নরনারীর জীবনের চিরন্তন সমস্যার অনুপস্থিতি শরৎ-উপন্যাসে লক্ষনীয়। আধুনিক মানুষের প্রত্যয়, প্রয়াস, ব্যর্থতা, জীবনতৃষ্ণা, জীবনজিজ্ঞাসা – এসবের কিছুই এখানে নেই। পরিচিত গৃহসংসারে তুচ্ছ ক্ষুদ্র মান অভিমান ও অস্বাভাবিক স্নেহের বা ভালবাসার তীর্যক প্রকাশ ; এই সম্বল করেই তিনি উপন্যাস লিখেছেন।" (শরৎচন্দ্রঃ পুনর্বিচার — অরুণ মুখোপাধ্যায়।)

সমালোচকের মন্তব্য আংশিক সত্য। শরৎচন্দ্রের জীবনতৃষ্ণা বা জীবনজিজ্ঞাসা ছিল না এমন কথা বলা যায় না, বরং বলা চলে শিল্পীর জীবনতৃষ্ণা ব্যাপ্তিলাভ করতে পারেনি। কারণ পরিচিত গৃহসংসারে তুচ্ছ ক্ষুদ্র মান-অভিমান তাঁর মননশীলতাকে জীর্ণ করে তোলে। গ্রাম-জীবনের অন্তঃসার শূন্য জাতিভেদ প্রথা, বৈধব্য যন্ত্রণার কাতরানি ও পতিতার পবিত্রতা রক্ষার অতিরেক উৎসাহ শিল্পীর মহত্তর চেতনার উন্মেষে বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে, শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারীর প্রত্যয়, প্রয়াস ব্যর্থতায়

মধ্য দিয়ে জীবনসংগ্রামে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। শ্রীকান্ত, বিপ্রদাস, মহিম প্রমুখ অতিপরিচিত নায়কদের ও জীবনতৃষ্ণা, মননশীলতা বা জীবন-জিজ্ঞাসা গভীরতর উপলব্ধিতে মহত্তর জীবনের সন্ধান খুঁজে পায়নি। কারণ, শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে গ্রামবাংলার লেখক। শিল্পীর জীবনচৈতন্য পল্লীগ্রামেই সঞ্চারিত সঞ্জীবিত। আবেগপ্রবণ, অধঃপতিত নরনারীর ভাষাকার তিনি। যে গ্রামজীবন সমাজশাপের নিঃশ্বাসে, ক্ষত-বিক্ষত, ভা'য়ে ভা'য়ে, জা'য়ে জা'য়ে পাড়া-পড়শীতে মারামারি, কোঁদল, মামলা-মোকদ্দমা মানুষের জীবনের ধারকে ভোঁতা করে দেয়, হয়তো সেই কারণেই তাঁর বৃহত্তর জীবনবোধ গ্রামে সংলগ্ন ছিল, "গ্রামেই ছিল তাঁর চৈতন্যের মূল শিকড়। সেই যে ছোটবেলায় জন্ম ও শৈশবের বন্ধনসূত্রে গ্রামকে তিনি অত্যন্ত আপন করে পেয়েছিলেন, সেই গভীর নৈকট্যচেতনা আর সারা জীবনে ঘোচেনি। বিচিত্র অবস্থান্তর আর বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তির মধ্যেও তাঁর বাল্যের দেখা গ্রাম তাঁর অস্তিত্বের মর্মমূলে সংসক্ত হয়েছিল। চেতনার এই ধরণের সংলগ্নতা একপ্রকারের fixation, তার হাত থেকে কারও পার পাবার উপায় নেই।" — (কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র/ নারায়ণ চৌধুরী)। ফলতঃ শরৎসাহিত্যে সার্বজনীন অনুভূতির সূক্ষ্মতা অনুপস্থিত।

বাস্তবিক, শরৎচন্দ্র বাঙালী মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের গতানুগতিক একান্নবর্তী পরিবারের সমস্যা; দাম্পত্য জীবনের সমস্যা, বাল-বৈধব্যের সমস্যা, কন্যাদায়ের সমস্যা ছাড়া আর কোন সমস্যার কথা ভাবতে পারেননি। আসলে—'শরৎচন্দ্রের মানুষরা ছোট, সমস্যাও ছোট। তাই কোনোটার আবেদন ঘরের চৌকাঠ ছাড়িয়ে বেশী দূর এগোয় না।" অথচ শরৎচন্দ্রের পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মনন ও চিন্তনে কতো প্রসারতা ছিল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাগীশ ছিলেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা ছিল দোষেগুণে মানুষের উত্তরণের প্রয়াস ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথের নায়ক গোরার জীবনজিজ্ঞাসা কারোর অবিদিত নেই। 'চোখের বালি'ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দার্শনিক

আত্মজিজ্ঞাসা, বৈজ্ঞানিক জগৎ নিরীক্ষা পরিমিত গণ্ডী ছাড়িয়ে মানব-জীবনের মহত্তর অনুভূতি উদার দিগন্ত স্পর্শ করে। অথচ যিনি 'চোখের বালি' থেকে অনুপ্রাণিত, 'চোখের বালি'র সঙ্গে তাল রেখে বেশী দূর এগোতে পারেননি। অবশ্য 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্ন'—উপন্যাস দুটির মধ্যে কিছুটা মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'চতুরঙ্গের' প্রকাশকাল (১৯১৬), সেই বছরেই প্রকাশ পায়—'পল্লীসমাজ', অথচ 'চতুরঙ্গের' আধুনিকতা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি আর 'গোরা' উপন্যাসের মহৎ ভাবনার উপলব্ধি শরৎচন্দ্রের আয়ত্তের বাইরে। কেবলমাত্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের মননশীলতা, বুদ্ধির প্রাচুর্য লক্ষণীয়, যদিও হৃদয়াবেগ মোটেই কম ছিল না। 'গৃহদাহ'-এর সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সাদৃশ্য দেখা যায়। দুটি উপন্যাসই ত্রিভুজ প্রেমের নিদর্শন। মহিম ও সুরেশের পাশে নিখিলেশ ও সন্দীপ, অচলার পাশে বিমলাকে মনে পড়ে। নারীর আত্মশুদ্ধি, নায়ক-নায়িকার আত্মচিন্তা যেমনটি 'ঘরে বাইরে'-তে প্রতিফলিত, তেমনটি মহিম, সুরেশ অচলা চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় না। যা আছে, তা হল আধুনিক নরনারীর দোটানা মনোভাব। এখানেই শরৎচন্দ্রের শিল্পী-সৌকর্যের সার্থকতা। আশ্চর্যের বিষয়, শরৎচন্দ্র যখনই পল্লীভিত্তিক রচনার ক্ষেত্র থেকে নগর ভিত্তিক রচনায় হাত দিয়েছেন, তখনই শিল্পরসের স্ফূর্তি বিকাশলাভে বাধা পেয়েছে।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক মননজাত উপন্যাসে। পল্লী-কেন্দ্রিক ও নগর কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার সমন্বয়। শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে মহান লেখক টলস্টয়ের 'রেসারেকসান' (১৯০০)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। 'রেসারেকসান'-এর নায়িকা একটি সাধারণ বেশ্যা। টলস্টয়ের এই বইখানি শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করেছিল ঠিকই কিন্তু ঋষি টলস্টয়ের নৈতিক নব-জাগরণের অমল শুদ্ধতা ও পুনরুজ্জীবন মহৎ আন্তরিক প্রয়াস ধরতে পারেন নি। তাই 'চরিত্রহীনে' প্রেমে আত্মবলিদান আছে, জীবনের নব-সার্থকতার অন্বেষা নেই। নায়ক নেখল্যুভভ পাপ, অনুতাপ ও মার্জনা ভিক্ষার নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এক নৈতিক শুদ্ধতায়,

নায়িকা কাটেরিনা ওরফে কাট্যুশাও ফিরিয়ে দিয়েছে নেখল্যুডভকে, রাজনৈতিক বন্দীকে জীবনসঙ্গী রূপে গ্রহণ করেছে, যাঁর সান্নিধ্যে জীবনের নবতর সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। কাট্যুশা চরিত্রে মহৎ জীবনের উত্তরণ ঘটেছে যেখানে সাবিত্রী চরিত্র আবেগনির্ভর আত্মোৎসর্গ খণ্ড-জীবনের চিত্রণ মাত্র। ব্যক্তিসত্তার সমগ্রতাকে শরৎচন্দ্র ধরতে চান না। সমাজ অননুমোদিত প্রেমকে নিয়ে তাঁর কারবার। এ কারবারে তাঁর সৃষ্ট নরনারীরা চালচিত্রের আড়ালে চলে যায়, মনের প্রতিমার স্থান প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তিন

পরিশেষে একটি ব্যাপার সর্বজনস্বীকৃত যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সময়কার চোখে-দেখা বাংলার গ্রামজীবনকে অবিকৃত রূপে এঁকেছিলেন। সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আশ্রিত নিরানন্দ গ্রাম, শিক্ষা দীক্ষা সময়চেতনাহীন গ্রাম, চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার আওতায় লালিত পালিত গ্রাম, অত্যাচারী জমিদার আর কুচক্রী পুরোহিত শোষিত গ্রাম। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এক একজন জমিদার, যেন প্রত্যেকেই মনুষ্যত্বহীনতার প্রতিমূর্তি। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের জীবানন্দ চৌধুরী, 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুজ্যে, 'পল্লীসমাজের' বেণী ঘোষাল টাইপ চরিত্র হিসাবে শরৎচন্দ্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি; তাছাড়া শাস্ত্র ব্যবসায়ী হীনমন্য ব্রাহ্মণ চরিত্রগুলি দারুণ উৎরেছে। 'মহেশ' গল্পের তর্করত্ন ঠাকুর, 'দেনাপাওনা'র ভন্ড শিরোমণি, 'পল্লীসমাজে'র ধর্মদাস, পরাণ ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী কুচক্রী যাজকতন্ত্রের প্রতিনিধি।

কনটেন্টের দিক থেকে শরৎ-চেতনায় নতুনত্ব না থাকলেও, গতানু-গতিক Traditional না হলেও, সনাতন ধ্যানধারণা পুষ্ট হলেও তাঁর পল্লীভিত্তিক রচনাগুলির মধ্যে ভারতীয় আত্মার বাণী ধ্বনিত হয়েছে। পতিব্রতা, সেবাপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ও কৃচ্ছ্রসাধন তাঁর নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সমধিক বিধৃত। অন্নদাদিদি, শুভদা, ষোড়শী, কুসুম, বিরাজ বৌ, কমললতা, সুনন্দা, সরযূ, সুরবালা এইসব নারী চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা ভারতীয় পতিব্রতা নারীর জীবনে অনবদ্য type

সৃষ্টি করেছেন। তাঁর style অনবদ্য। বক্তব্য বা কনটেন্ট যা-ই হোক, তিনি typical চরিত্র সৃষ্টিতে, আটপৌরে সমাজচিত্র অংকনে অসাধারণ স্রষ্টা। বিশেষতঃ গ্রামীণ পটভূমির উপরে লিখিত গল্প-উপন্যাসগুলি শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে শরৎ-জয়ন্তী (১৩৪৩) উপলক্ষ্যে শরৎচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকুন্ঠিত অভিনন্দন বার্তা, যা সর্বকালের পাঠকের অন্তরের কথা—

"জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তাদের অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় হয়নি। ..... এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষা ভাজন।"

জনগণের শিল্পী

শরৎচন্দ্র সাধারণত জনগণের শিল্পী। যে জনগণ দুর্বল, অসহায়, উপায়হীন, অত্যাচারিত এবং শোষিত। যে জনগণের মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন-বর্ণের ভেদাভেদ নেই, ধর্মাধর্মের পার্থক্য নেই, বড়লোক ও গরীব লোকের শ্রেণীবিন্যাস নেই. প্রাদেশিকতার বিচ্ছিন্নতা নেই। যে জনগণ সমাজ ও দেশের বৃহত্তর সমষ্টির অংশ। যে জনগণের সন্ধান মেলে পাণ্ডববর্জিত অজ পাড়াগাঁয়ে, বন্যাক্লিষ্ট, ম্যালেরিয়া আক্রান্ত বাঙলাদেশের গ্রামান্তরে, আবার যে জনগণের সন্ধান মেলে আলো ঝলমল শহরের উপকণ্ঠে, কিংবা আলোরই অপর পিঠ অন্ধকার-নিষিদ্ধ এলাকায়। যে জনগণের একমাত্র পরিচয়, তারা মানুষ। রক্তমাংসের মানুষ। পাপে ও তাপে জর্জরিত মানুষ। সমাজ সাপের নিশ্বাসে বিষাক্ত মানুষ। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে স্খলিত মানুষ। সেই মানুষের পরিচয় পাই শরৎসাহিত্যে। বিশ্বের যে কোন মহান শিল্পীর সঙ্গে এইখানেই তাঁর মিল!

আর এই পুণ্যমন্ত্রটি অভিজ্ঞতালব্ধ। জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে, নানা স্খলন পতনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মানুষের ভীড়ে শরৎচন্দ্রের শিল্পসত্তা স্বতোৎসারিত হয়েছে। আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগ দিয়ে মনের মানুষের ছবি অঙ্কিত করেছেন। তিনি নিজেই অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন— "নানা অবস্থা বিপর্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তি সংস্রবে আসতে হয়েছিল, তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তাঁরা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছেন যে ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব সকল অপরাধের চেয়েও বড়।" (১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিনে প্রদত্ত স্বীকৃতি।)

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভর করে মানুষের দেহের মধ্যে যে ভগবান আছেন অর্থাৎ যা শুভ, সুন্দর, শাশ্বত সেই পরম বস্তুর সন্ধান

করেছেন। পাপীর চিত্র অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু সে পাপীর মাঝখানে পুণ্যাত্মার সন্ধান করেছেন। পাপীর সঙ্গে একাত্মভাবে মিশে গেছেন, কিন্তু পঙ্কের মধ্যে পদ্মফুলের সৌন্দর্য তিনি মুগ্ধচোখে দেখেছেন। তিনি কবি রাধারাণী দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন—"তোমাদের মতো কবিকল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি, এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয়তো সেটাই ফুটে উঠেছে বারংবার আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধহয় এত ছোট-বড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।"

আসলে শরৎচন্দ্র অকৃত্রিম শিল্পী, পরিশীলিত শিল্পী, পরিমার্জিত শিল্পী। মানুষের জীবনকে নিয়ে ছেলে-খেলার চিত্র অঙ্কিত করেননি, পরিবেশনায় স্থূল পরিচর্যা নেই, মোমের মত নিঃশেষে গলে গিয়েও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে তরলতা নেই ; যুগের দিনলিপি প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই. কিন্তু উপস্থাপনায় সুরুচিকর পরিমিতি বোধ আছে। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের কেবলমাত্র কয়েকটি গল্পের কথা মনে পড়ে। সমাজের নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি 'মহেশ' গল্পে গফুরমিঞা, "অভাগীরস্বর্গ" গল্পে দুলে-বৌ অভাগী ও তার হতভাগ্য ছেলে কাঙালী, 'মেজদিদি' গল্পে মাতৃহারা উপায়হীন কেষ্ট, 'হরিচরণ' গল্পে ভৃত্য হরিচরণ, 'হরিলক্ষ্মী' গল্পে দরিদ্রা অভাগা বধূ কমলা, 'বাল্যস্মৃতি' গল্পে রাঁধুনীঠাকুর গদাধর প্রমুখ সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে সমাজমনস্ক সাহিত্যিকের অর্থনৈতিক চেতনার কথা উদ্ভাসিত হয়েছে। উৎকর্ষতার বিচার আমার আলোচ্য নয় কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করি। জনগণের প্রতিভূ এরা।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে শোষক ও শোষিতের মূর্তরূপ প্রতীয়মান হয়। গোমস্তা এককড়ি ব্রাহ্মণ শিরোমণি জমিদার জীবানন্দ শোষকদের প্রতিনিধি, আর হরিহর সর্দার বিপিন প্রভৃতি প্রজারা শোষিতের প্রতিরূপ। শরৎচন্দ্র বিশ্লেষণপন্থী, কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী নন। তিনি আশাবাদী। ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের

দুজন প্রাণবন্ত প্রতিনিধিকে খুঁজে পেয়েছেন। একজন হিন্দুনারী—সন্ন্যাসিনী ষোড়শী, আরেকজন সন্ন্যাসী ফকির সাহেব। রিক্ত, অধঃপতিত, অর্থনীতি ও সমাজনীতির যূপকাষ্ঠে বিদ্ধ মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করে পল্লীবাঙলার বুকে দুটি ধর্মের নারী ও পুরুষ। উদ্দেশ্য মহৎ হৃদয়ের জয়; মানবতার বন্দনা।

শরৎচন্দ্রের যুগেই সামন্ততান্ত্রিক ভাঙ্গনের যুগ পরিলক্ষিত হয়। জমিদার বড়লোকের কথায়ও শরৎসাহিত্যে স্থান পেয়েছে; গ্রাম্য দলাদলি, স্বার্থপরতা, জাতি, বৈষম্য, ঈর্ষা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা স্থান পেয়েছে কিন্তু সবচাইতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে মানুষের প্রতিবাদ। 'পল্লীসমাজে'র রমেশ, 'শেষপ্রশ্নে'র আশুবাবু; 'শুভদা'র ভগবান নন্দী কিংবা 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুজ্যের মত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র শরৎসাহিত্যে ভীড় করেছে। রাজলক্ষ্মী অন্নদাদিদি, কমললতা, অভয়া, কিরণময়ী, কমল প্রভৃতি চরিত্রগুলির গ্লানি, জয়-পরাজয়, ব্যর্থতা অক্ষমতা, অসহায়তা, কামনা-জর্জরিত নারী জীবনের ছায়া শিল্পীর চেতনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই সমস্ত নারীর জীবন আমরা সর্বত্র দেখতে পাই—দৈনন্দিন, পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রার মধ্যে। এরা জনগণেরই একটি বিরাট অংশ। কল্যাণবোধের প্রতীক স্বেচ্ছায় সর্বত্যাগিনী অন্নদাদিদি অনেকেরই পরিচিত কিংবা লক্ষ্মীর মত সর্বংসহা রাজলক্ষ্মীকে প্রত্যহ পাখিডাকা ভোরে আমাদের মনে পড়ে।

শরৎসাহিত্য আলোচনাকালে পাবলো নেরুদার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"I feel no loneliness at night/in the obscurity of earth/I am people, the innumberable people," শরৎচন্দ্রও অনুরূপ লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের একজন। আর সেই কারণেই শরৎসাহিত্য জনগণ থেকে অভিন্ন। শরৎসাহিত্যের পাত্র ও পাত্রীরা একান্তভাবে বাঙালীকেন্দ্রিক হলেও – এর মধ্যে ভূগোল-ইতিহাসের সীমারেখা অতিক্রম করে অগণিত মানুষের জয়গান ঘোষিত হয়েছে এবং সেই কারণেই ভারতবর্ষের পাঠকসমাজে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি, অদূর ভবিষ্যতেও হবে না, কারণ শরৎসাহিত্য ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশীভাষায়

অনূদিত হয়ে প্রশংসা অর্জন করেছে। ইংরাজীতে 'শ্রীকান্ত' (১ম) 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'চরিত্রহীন', 'নিষ্কৃতি', ও 'মহেশ' গল্প অনূদিত হ'য়েছে। রুশভাষায় 'গৃহদাহ', শ্রীকান্ত (১ম-৪র্থ), আঁধারে আলো ও 'মহেশ' এবং ইতালীয় ভাষায় 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। তাছাড়া উর্দু, গুজরাটি, হিন্দী, উড়িয়া, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, প্রভৃতি ভারতীয় প্রায় সকল ভাষায় তাঁর গল্প উপন্যাস অনূদিত হওয়ায় 'তিনি জনগণের শিল্পী' বলে প্রমাণিত। * Institute of Asian people in Moscow-র একজন বিশিষ্ট সদস্য শরৎসাহিত্যের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা অনস্বীকার্য – 'We have read and heard very much about the exceptional popularity of Sarat Chandar's works in India. We see the reason for this in the fact that telent combines many merits ; knowledge of life and talented, realistic description of it, humanism and democratic manner expressed in the warm portryal of life and feelings of those badly treated by fate, deep understanding of human phychology personified in convincing characters and finally, plain language full of inner harmony and beauty understandable to all."

বাঙলাদেশের জনগণের হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর শরৎচন্দ্র। শুধু কি ভারতবর্ষের মানুষের একান্ত প্রিয়! বাস্তবতার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে যে শরৎচন্দ্র জনগণের হৃদয় জয় করেছিলেন রবীন্দ্রযুগে, সেই শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য জনগণের হৃদয়রসে জারিত। জনগণের সেবার মধ্যে মানবাত্মার সুর অনুরণিত হয় বলেই শরৎসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

সমাজতান্ত্রিক চেতনা

নিশান্তে পথপ্রান্তে যে সমস্ত নারীপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের অধিকাংশই শরৎসাহিত্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের পরিচিত মুখ। সে মুখ চেনা যায় সহজে। মনের মণ্ডপে স্থায়ী আসন পেতেছে। কেহ দারিদ্র্যের কশাঘাতে ন্যুব্জ, ম্লান মুখ, বেদনায় অস্থির, কেহ বা চাতুর্যে প্রখর-মুখর, কেহ বা গোঁড়ামীতে ভণ্ড-সাধু, কুচুটে। কারো ভদ্রতার অন্তর্বাসে শয়তানীর আস্তানা। কেহ ভণ্ড সমাজ-নীতিবিদ্, কেউ ভ্রান্ত রাজনীতিবিদ্, কেউ নীতিবাগীশ তার্কিক কেউ বা সমাজসেবী আত্মভোলা মানুষ। ভালমন্দ, সুখ দুঃখ, পাপ-তাপ, জীবন-মৃত্যু সঙ্গে নিয়ে শরৎসাহিত্যের নরনারীরা পথ চলে—যে পথ আঁকা-বাঁকা, কন্টকাকীর্ণ, বন্ধুর। এই পথ চলেছে কানানদীর পাশ দিয়ে সরস্বতী-রূপনারায়ণ-মুন্ডেশ্বরী ছাড়িয়ে সুদূর বর্মায়। বন্যা-প্লাবিত, ম্যালেরিয়া জর্জরিত, দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চল ভুরসুট পরগণা হাওড়া-হুগলীর একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলের মানুষেরা নিরীহ কৃষিজীবি এবং একদা ব্রাহ্মণ শাসিত। এই অঞ্চলের একটি গ্রাম দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্ম। স্মৃতি বিস্মৃতি জড়িত এই অঞ্চলের পথঘাট, নদীখাল, নর-নারী, পশু-পক্ষীর কথা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে : আবার অনুরূপভাবে বার্মাজীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জীবনের অশ্রুসিক্ত কাহিনী সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তবে সুনিপুণ শিল্পীর তুলিকায় চিত্রিত হওয়ায় রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। আবার পরিণত বয়সে হাওড়ার পানিত্রাস গ্রামে থাকাকালীন যে সমস্ত মানুষের সন্ধান পেয়েছেন, তাদের কথাও দৃষ্টির দর্পণে ধরা পড়েছে। রাজনীতির সংস্রবে বিভিন্ন নেতার চরিত্র সৃষ্টিতেও উজ্জ্বল। এক অর্থে তিনি আঞ্চলিক, অন্য অর্থে তিনি সামাজিক এবং সমাজ-মনস্ক শিল্পী। আর এই কারণেই তাঁর সৃষ্ট শিল্প জনগণের জন্য। যে শিল্পে জনগণের মনের কথা শিল্পীর অনুকম্পায় অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে, শরৎসাহিত্যেও তাই —"A thing is good only when it brings benefit to

the masses of the people."

"পল্লীসমাজ" উপন্যাসে জমিদার বেণী ঘোষালকে আমরা চিনি। বেণীর চক্রান্তে রমার মিথ্যা সাক্ষ্যে রমেশকে জেলে যেতে হয়েছে এরূপ চক্রান্ত ও got up case এখনো চলে সমাজ জীবনে। সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন না এলে ভবিষ্যতেও চলবে। তবে রমেশের জন্য মমত্ববোধ গ্রামের মানুষের তখনো ছিল। তখনো মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। রমাদের বাড়ীর দুর্গাপূজায় কোন মানুষ যোগদান করেন নি। বেণীর আস্ফালনের মুখে বৃদ্ধ সনাতন হাজরাও কথা শুনিয়ে দিয়েছে। তুষ্টু কলুর ছেলে বেণী ঘোষালের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। পীরপুরের দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান প্রজারা দলবদ্ধ হয়েছে। পরস্পর ভাই ভাই। চক্রান্তকারী, গেঁয়ো মাতব্বর বেণী ঘোষালের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের বিদ্রোহ—যা কৃষক জাগরণের কথাই মনে করিয়ে দেয়। সমাজমনস্ক শিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখনীতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রতিরোধ লক্ষণীয়। এর পটভূমিকা হাওড়া ও হুগলী।

কংগ্রেসী রাজনীতি করতেন শরৎচন্দ্র। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। 'জাগরণ' শরৎচন্দ্রের একটি রাজনৈতিক অসম্পূর্ণ উপন্যাস। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমির উপর লেখা। নায়ক অমরনাথ। তার নেতৃত্বে অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই। আর একা থাকার দিন নেই, যে যেখানে থাকুক—সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা। শোষণের বিরুদ্ধে, শাসনের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বাঁচতে হলে প্রয়োজন ঐক্য। সেই ঐক্যের signal দেখা যায় 'জাগরণে'এ। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পাই। কংগ্রেসী হয়েও তিনি আপোষকামী সুবিধাবাদী ছিলেন না। যে কথাশিল্পী সোজাসুজি রাজনীতিতে নেমে এসেছিলেন, তা সখের রাজনীতি নয়। যুগযুগান্তরের দুঃসহ বেদনা, লজ্জা, গ্লানি, অপমান তাঁকে একদা বাঙলাদেশের নেতায় পরিণত করেছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনিই একমাত্র কথাশিল্পী, যিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। চরকা কেটে স্বরাজ আসা অসম্ভব—এ মত

তিনি জাতির জনক গান্ধীজীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন— Swaraj can be helped by soldiers not by the spiders.' শরৎচন্দ্রের বক্তব্য পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট। পৌনে দুশো বছর ধরে যে সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তি বলপ্রয়োগ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রয়েছে, তার কবল থেকে অহিংস পথে ক্ষমতা ছিনিয়ে আনা যাবে না। একথা শরৎচন্দ্র ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাই বলেছিলেন— 'এতবড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামের রক্তপাত হবে না? হবেই ত! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে – সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে?'' নন ভায়ওলেন্স খুব noble idea কিন্তু achievement of freedom is nobler — hundred times nobler.'

পথের দাবী উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র সশস্ত্র ও রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্যেই দেশের মুক্তি আসতে পারে। এই বোধের সঙ্গে অন্য বোধ সংযুক্ত হয়েছে। যে বোধ সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বোধ, যে বোধ শ্রমিক কল্যাণবোধ। যে বোধে ভারত ও বর্মার বিপ্লবের কথা স্থান পেয়েছে। যদিও সব্যসাচীর মত রোমান্টিক বিপ্লবী নায়ক সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে, যেখানে স্থান পায়নি নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি কোনও বাস্তববাদী শ্রমিক বা কৃষক নেতা। যা ভারতীয় Tradition বলে মনে হয়। তথাপি 'পথের দাবী' ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করল (১৩৩৩ সন)। রাজদ্রোহের অপরাধে ভারতের এই কথাশিল্পীর উপন্যাস নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল। এই কারণেই 'পথের দাবী' ভারতবাসীর কাছে এত জনপ্রিয়।

অথচ আরো কথা আছে। 'পথের দাবী' উপন্যাসে আরো দাবী উচ্চারিত হয়েছে। সেই দাবী পথ চলার, যে পথ সুদূর বিস্তৃত। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রভাব ভারতের জনজীবনে বর্তে ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে শরৎচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তার জন্যে তিনি পড়াশুনা করেছিলেন প্রচুর। স্বাধীনতার রক্ত কমল ফোটাতে হলে চাই

রক্ত, অফুরন্ত রক্ত। শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারা, মধ্যবিত্ত সকলের সংঘবদ্ধ ঐক্যেই তা সম্ভব! পৃথিবীর ইতিহাস সে সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে। দেশের ও দশের মুক্তির জন্যে বিপ্লব অনিবার্য, অহিংসার মধ্যে তা সম্ভব নয়। 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচী বলেছেন—"হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়, এই তার বর এই তার অভিশাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হাঙ্গেরিতে তাই হয়েচে, রুশিয়ায় বার বার এমনি ঘটেচে, ৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। কুলি-মজুরদের রক্তে সেদিন শহরের রাজপথ একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছিল। এইতো সেদিনের জাপান, সে দেশেও দিন মজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতী।"

শরৎচন্দ্রের রাজনীতি যে কতখানি প্রগতিশীল তা সব্যসাচীর উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়। যদিও "পথের দাবী" উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও ভাবনার সমন্বয় যথাযথ হয়ে ওঠেনি। তথাপি বাঙলা কথা-সাহিত্যের প্রাঙ্গণে পথের দাবী'তেই প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক চেতনার কথা মনে আসে।

'দেনাপাওনা' উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যায় মিলিতভাবে জমি রক্ষার প্রতিজ্ঞা। গরীব, ভূমিহীন কৃষক-মজুর হরিহর, সাগর সর্দার, বিপিনের দল জোট বেঁধে নারীলোলুপ, মদ্যপ, দাঙ্গাবাজ জমিদার জীবানন্দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বৃত্ত তৈরী করেছে। মাটিতে মায়ের মুখ-সেই মাকে কিছুতেই অপরের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। মাটির কথা জমির কথা এলেই পার্লবাকের 'Good Earth' এর কথা মনে আসে। তবে 'Good Earth' এর মহানুভবতা 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে আশা করা উচিৎ নয়।

'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের র‍্যাডিকাল চিন্তা ধরা যায়। অবশ্য চিরকালই তিনি সনাতনী ভাবধারার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। তিনি তথাকথিত ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, সত্যাসত্যের এমনকি প্রেমের নগ্নরূপ দ্বিধাহীনভাবে সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। যে তাজমহল পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য বলে পরিচিত, সে আশ্চর্য বস্তুটির সৃষ্টির মূলে ছিল

বাদশার প্রেম নাকি শুধু একবিন্দু নয়নের জল।' কিন্তু তাই কি সব! কত হাজার হাজার মানুষের স্বেদে-রক্তে—শ্রমে ভালবাসায় ও মৃত্যুতে গড়ে উঠেছে এই প্রেমের সৌধ তা কথাশিল্পীর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যায়নি। তিনি সোজাসুজি মন্তব্য প্রকাশ করলেন—"এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের অক্ষয় দান।" বাস্তবিক এ সম্রাটের এক প্রকার বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। মোঘল বাদশাহের অন্তরবেদনা দিয়ে মমতাজের প্রতি প্রেম নিবেদন নয়—কয়েক সহস্র মানুষের তাজা রক্ত নিয়ে এ সাধের সৌধ তৈরী; যে মানুষের কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। শরৎচন্দ্র সেই মানুষের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকালে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, পি, সি, রায়ের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এদের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রায়ই মতের গরমিল হতো। প্রত্যক্ষভাবে শরৎচন্দ্র তা উপলব্ধি করতেন এবং সে সম্পর্কে গান্ধীজীর তাঁর সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়েছে। সময় সময় উভয়ের পরস্পরের মধ্যে 'debate'ও হয়েছে। কারণ ছিল। সেই অসহযোগ আন্দোলন কালে আরেকটি মতাদর্শ দানা বেঁধে উঠেছিল—তাহলো Socialism সমাজ মনস্ক শরৎচন্দ্রের চোখ থেকে তা এড়িয়ে যাবার কথা নয়। 'Socialism' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। গান্ধীজীর রাজনীতির প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। কারণ শরৎচন্দ্র গান্ধীজী সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছিলেন—তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকেরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।'

(বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ — ১৩৪১)

শুধু তর্কে না গিয়ে, এই একটিমাত্র উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে শরৎচন্দ্র সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। হয়তো অনুকূল পরিবেশ ছিল না বলেই তিনি সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ভিড়ে যাননি; কিন্তু বোধ ছিল সমাজতান্ত্রিক। মান্ধাতার আমলের সমাজব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করা, সামন্ততান্ত্রিক উপসৌধগুলি গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করা ছিল

তাঁর উদ্দেশ্য। তাইতো তাঁর ক্রোধ—অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে, শাস্ত্রাচারে অন্ধ হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে, অন্ধ ধর্মাধর্ম, সত্যাসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আর সেই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য চাই—বিপ্লব। এবং তাঁর মতে "বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন।" কংগ্রেসী শরৎচন্দ্রের এই ভাবনা আজকের তরুণের কাছে অস্পষ্ট নয়। শরৎচন্দ্র সত্যদ্রষ্টা কিনা, তা আগামীকাল বিচার করবে, কিন্তু তিনি যে একজন প্রগতিশীল লেখক ছিলেন, তা অবশ্যস্বীকার্য।

শরৎচন্দ্র বলেন: 'শাস্ত্রে-টাস্ত্রে অনেক সাধনার কথা আছে—আমার unfortunately মনটা একেবারে উল্টা দিকে গেছে- সাধনার আর কোন মূল্য খুঁজে পাই না। শাস্ত্র সাধনা যা ছিল সবই যদি এত বড় ছিল, আমরা এত ছোট হলুম কেন?'' এই স্বীকৃতি বা আত্মনিরীক্ষার মধ্যেই বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাই যা মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তির মননের মতই প্রশ্নসঙ্কুল। যদিও শরৎচন্দ্র সামাজিক কাঠামো বলতে অর্থ-নৈতিক বা শ্রেণীগত কাঠামোকে বুঝতেন না, জাতিবর্ণভিত্তিক কাঠা-মোটিকেই বুঝতেন। কারণ, তিনি ছিলেন traditional বুদ্ধিজীবী।

তিনি আরও বলেন—'আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরান জিনিসটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না। ······ ' আর একদল Revolution চাইছে—Revolution মানে অন্য কিছু নয় আমূল পরিবর্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না, তাঁরা চান Reforms অর্থাৎ মেরামত করা। আমার মনে হয়, মেরামত করা জিনিসটা ভাল নয়।" শরৎচন্দ্রের এই স্ববিরোধে বা self contradiction-এ চরম অব্যবস্থিত চিত্ততার পরিচয় স্পষ্ট। তিনি একই সঙ্গে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল।

ভারতীয় ব্যক্তিত্বচেতনা বাংলার নিজভূমিতে যে রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তারই সূচনা। ১৯০৫ থেকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দেশে যা কিছু হয়েছে, তারই মধ্যে ঐতিহ্যবাহিতা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ, তাঁর রচনায় যেটুকু শ্রেণীবোধ দেখা যায় তা বাঙালী গ্রামীণ ও শহরের মধ্যশ্রেণীর জাতিবর্ণ কাঠামো থেকেই জাত। অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে নয়। তবু,

মনে হয় শরৎচন্দ্র ব্যক্তিসত্তাকে লালিত করেছেন অকৃত্রিম দরদে ও নিষ্ঠায়, তাঁর স্ববিরোধের গভীর বেদনাবোধ পৃথিবীর হরেক রকম বৈচিত্র্যই (যেমন রাশিয়া ও ইউরো-সাম্যবাদ) জাগিয়ে তোলে সমাজতান্ত্রিক চেতনায়। তাঁর শেষবয়সের রচনায় সেই সাম্যবাদী চিন্তাধারা ও কার্যক্রম রূপলাভ করেছিল। তিনি সমাজ ভাবনায় প্রগতির অভিমুখে অগ্রগামী শিল্পী।

পল্লীসমাজ ঃ সমাজ চিন্তার শিল্পরূপ

শরৎচন্দ্র সমাজের ফ্রেমে-আঁটা মানুষ ছিলেন না। যে সকল আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন একান্ত প্রত্যাশিত, তা তিনি খুশিমত কখনো-সখনো গ্রহণ করেছেন, এবং যে সকল কঠোর বিধিনিষেধ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপর খড়্গাঘাত করেছে বা মানুষের চলার পথ রুখে রেখেছে, তা তিনি প্রত্যাখান করেছেন। কারণ তিনি যথার্থ স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। সত্যিকার স্বাধীনচেতা মানুষকে তথাকথিত সামাজিক 'ভদ্দলোকেরা' পছন্দ করে না বা সহ্য করতে পারে না। মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের উচ্চ ধারণা ছিল অগাধ, কোন বাছবিচার ছিল না, ছিল না জাত-বিচার, এবং বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির বিচার। অমার্জিত, নিরক্ষর মানুষদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে যেতে পারতেন। সেই অন্তরতম মানুষেরা আত্মার আত্মীয় জ্ঞান করে নিজেদের সুখ দুঃখ প্রকাশ করত। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধুকে লেখা একটি চিঠির মধ্যে সেই সত্যতার প্রমাণ মেলে—"গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ।" ১

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি সমাজচিন্তার সার্থক প্রতিফলন। শরৎ-প্রতিভার অনন্য নিদর্শন এবং প্রধান উপন্যাসগুলির একটি। বাস্তবিক, ১৯১৬ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬, জানুয়ারী), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭, নভেম্বর), 'দেবদাস' (১৯১৭, জুন), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬, নভেম্বর), শ্রীকান্ত'-১ম পর্ব (১৯১৭, ফ্রেব্রুয়ারী), 'শ্রীকান্ত'-২য় (১৯১৮, মে-সেপ্টেম্বর), 'গৃহদাহ' (১৯২০ মার্চ), 'দেনা পাওনা' (১৯২৩, আগষ্ট),-এর শিল্পোৎকর্ষ অনস্বীকার্য।

'পল্লীসমাজ'-এ তাঁর দেখা গ্রাম আর চিত্রিত গ্রাম একাকার হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের অংকিত গ্রাম হাওড়া ও হুগলী জেলায়। রেঙ্গুন থেকে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি তাঁর সহধর্মিনী হিরন্ময়ী দেবীকে নিয়ে ১৯১৬ সালে

১, ঔপন্যাসিককে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।

এপ্রিল মাসে হাওড়ার বাজে শিবপুরে বসবাস সুরু করেন এবং ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এখানে থাকেন। কিন্তু জন্মভূমি দেবানন্দপুরের স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন নি। এই গ্রামটি তাঁর সাহিত্যে কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। রেঙ্গুনের পাট শেষ করে দেশে ফিরে তিনি সমাজভিত্তিক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং এই সময় থেকে উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি শহরাভি-মুখী হয়ে ওঠে।

'পল্লীসমাজ'-এ নাগরিক ভাবজীবনের কিছু কিছু ছায়াপাত ঘটেছে। রমেশ নাগরিক শিক্ষায় পরিমার্জিত। সমাজ সংস্কারে উৎসাহী অনুভূতি-শীল যুবক। তবে, তার দেখা গ্রাম এঁদো বদ্ধ জনপদ — শহরের কোন ঘাত-প্রতিঘাত সেখানে লাগেনি। অথচ এই সমস্ত গ্রাম কোলকাতা শহর থেকে বেশী দূরে নয়। যে সময়ে তিনি গ্রামের চিত্র অংকন করতে মনোনিবেশ করেন সেই সময়টা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কাল। যে কালে স্বদেশপ্রেমের জোয়ার ব্রাহ্ম-সমাজের প্রগতিশীল চিন্তাধারা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতাবাদ কোলকাতার শিক্ষিত সমাজকে নাড়া দিয়েছিল ভাবদ্বন্দ্বের টানা পোড়েনে নাগরিক জীবন যখন দ্বিধাগ্রস্ত, সেইসময় শরৎচন্দ্র নীলকন্ঠের মত সমস্ত আলোড়নের ঊর্দ্ধে থেকে বুদ্ধি-বাদকে নস্যাৎ করে হৃদয়বত্তার ব্যাপ্তিতে গ্রাম্য-সমাজের চিত্র অংকন করে চলেছেন, যে গ্রাম-জীবন সামাজিক রীতি-নীতি-সংস্কারে সংকুচিত ও পঙ্গু, যে গ্রাম-জীবন ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ভীত, সন্ত্রস্ত; যে গ্রাম-জীবন জমিদার-জোতদার-মহাজন কর্তৃক শোষিত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত, যে পল্লীসমাজ ভন্ডামী গোঁড়ামী ও ন্যাকামীতে পরিপূর্ণ; গ্রাম জীবনের সেই অভিজ্ঞতার চিত্র যেমন শরৎচন্দ্রের লেখনীতে শিল্পরূপ লাভ করেছে, তেমনি নারী হৃদয়ের মাধুর্য, সহনশীলতা, সেবার নিষ্ঠা, মাতৃত্বের ক্ষুধা, বৈধব্যযন্ত্রণা ও পতিভক্তি লক্ষণীয়। আবার নিষিদ্ধ সমাজ-অননুমোদিত প্রেমের বিশ্লেষণে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি মমত্ব ও শুভ চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধকে বাড়িয়ে দেয়। গ্রাম জীবনের অন্তরালে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের যেমন ব্যর্থতা, হতাশা,

বেদনা উৎসারিত, তেমনি প্রাণলোকের নেপথ্যে স্নেহ প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত।

দুই

এই পটভূমিকায় যারা বাস করে, তাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। মাটির প্রতি তাদের টান জন্মগত। সামতাবেড়ে থাকার সময় জেলে, কামার, কুমোর, বাগদী, বাউরী প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনযাত্রার মূল্যায়ণ খুঁজেছেন। গাঁয়ের দা'ঠাকুর তিনি—"কত যে সালিশি মেটাতে হয়, কত যে গৃহ-কলহের নিষ্পত্তি করতে হয় এমনকি স্বামী স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদেরও মীমাংসা করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। এছাড়া বারোয়ারীর চাঁদা তোলার তদারক করার প্রয়োজন হয়, ঘরে আগুন লাগলে নিভাবার ব্যবস্থা করতে হয়, কারো কঠিন ব্যারাম হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, বিয়ের ঘটকালি করতে হয়, বিয়েবাড়ী, শ্রাদ্ধবাড়ীতে গিয়ে বিলি ব্যবস্থা করতে হয়—এমনি কত কাজ।" (কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাছে ক্ষমাশীল শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি।)

এই পটভূমিকায় পল্লীসমাজের নীচতা ও হীনমন্যতার একাধিক চিত্র জীবন্তরূপ লাভ করেছে। বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী এরূপ নীচতা ও ভণ্ডামির প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি। সমগ্র গ্রাম জীবন এই সব কুচুটে দুষ্কর্মকারীদের কুকর্মে ভারাক্রান্ত। পৃথিবীতে এমন কোন দুষ্কর্ম নেই যে তারা করেনি। নারীর সতীত্ব নষ্ট করা, মিথ্যা কুৎসা রটনা করা, ঘরে আগুন দেওয়া যেমন তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, তেমনি জাল. জুয়াচুরি, চুরি তাদের অভ্যস্ত জীবনের অঙ্গ। এই সব পাপাচারীদের শরৎচন্দ্র ক্ষমা করেননি। এখনও পল্লীসমাজে এরূপ যন্ত্র পরের অমঙ্গল সাধনের জন্য গতিশীল – "যন্ত্রের মত গতিশীল, কিন্তু যন্ত্রের মতই প্রাণহীন।" ২

পঞ্চাশ বছর আগেকার গ্রামের যে চিত্র 'পল্লীসমাজে' অঙ্কিত হয়েছে, সেই গ্রাম্য পরিবেশের দৃশ্য এখনও যেখানে সেখানে দেখা যায়। অনেক কিছু দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু প্রগতিশীলতার নামে এখনও সেই ভণ্ডামি; সেই নিষ্ঠুরতা আজও চোখে পড়ে। যেহেতু পঞ্চাশ বছর আগেকার

২ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ 'শরৎচন্দ্র'।

পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ছিল ব্রাহ্মণ শাসিত। বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার প্রমুখ ছিলেন সেই সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের খেয়াল খুশি ও উৎপীড়ন বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হত। তারা নিজেরাই শিক্ষা-দীক্ষায় ও সম্পদে বঞ্চিত ছিল; সম্বল ছিল সামান্য সামাজিক ক্ষমতা।

ধর্মদাস, বাঁড়ুয্যে মশাই, দীনু ভট্টাচার্য প্রমুখ পরপ্রসাদভোগী ব্রাহ্মণ, এঁরাও সমাজের শাসকশ্রেণীর অনুগত। ধর্মদাসের ভালমানুষীর বাহুল্য, দীনু ভট্টাচার্যের অপরিমিত লালসা, বাঁড়ুয্যে মশায়ের চাতুর্য, ধৃষ্টামি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির মূলে রয়েছে তৎকালীন অর্থনৈতিক সঙ্কট। দুর্বিষহ দারিদ্র্যই তাদের আত্মবঞ্চিত ও আত্মপ্রতারিত করেছে। সমাজের তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা ন্যায়-ধর্ম ও মনুষ্যত্বের আলো থেকে নির্বাসিত। উচ্চবর্ণের মানুষেরা অশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রভাবে নিম্নবর্ণের মানুষের সমপর্যায়ে নেমে আসে। গ্রামের তথাকথিত চাষাভূষাও মুসলমান সম্প্রদায় উচ্চবর্ণের মত নীচ ও নিমকহারাম নয় বরং তাদের মধ্যে একতা আছে। কিন্তু তাই বলে সমাজের প্রাণ-নির্যাস কি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেছে? জীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু, ও স্বার্থপর সমাজের নগ্ন রূপ যেমন তিনি অঙ্কিত করেছেন, তেমনি সেই মুমূর্ষু সমাজকে প্রাণরসে উজ্জীবিত করার জন্যে রমেশের মত আত্মস্থ চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের লজ্জাকর আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও কুৎসিৎ কলহ বিবাদের পাশে, আশা ও আদর্শের ধ্যানমূর্তি রমেশের চরিত্র অনন্যসুন্দর। সে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সর্বস্ব পণ করে সমাজের অধোগতিকে রুখতে চেষ্টা করেছে, এই শুভ-বুদ্ধির জাগরণ পল্লীসমাজে লক্ষণীয়। রমেশ পরাজয় স্বীকার করেনি এবং শরৎচন্দ্র নিজেও। যেহেতু স্রষ্টার ব্যক্তিচরিত্র একটা বিশিষ্ট পরিবেশে গড়ে উঠেছে সেই কারণেই তাঁর বিশ্বাস-সংস্কার, শুভাশুভ বোধ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা প্রতিবেশী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান অন্ধকার সমাজের বুকে আকাশের আলোর শিখা শিল্পীর চোখে ধরা পড়েছে। 'পল্লীসমাজ' উপ-

ন্যাসে শিল্পীর বিশেষ অনুভূতি, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছে তারই ভিত্তিতে তাঁর শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র যে একজন জাতশিল্পী ছিলেন, 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে তা প্রমাণিত। বিদেশের শিক্ষা শেষ করে রমেশ নিজের গ্রামের সেবা করতে ফিরে এসেছে। গ্রামের সর্বসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করার চেষ্টা করেছে, সদিচ্ছা ও শুভ প্রয়াস সত্ত্বেও গ্রামের মানুষ তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। মেলামেশার সুযোগ না থাকায় সাধারণ অশিক্ষিত মানুষেরা উচ্চ শিক্ষিত মানুষদের এড়িয়ে চলে। কিন্তু ত্যাগের মধ্য দিয়েই মানুষকে চেনা যায়, তাই পরের উপকার করতে গিয়ে রমেশের জেলে যাওয়া সাধারণ মানুষের মন কেড়ে নেয়, রমেশের এই মহাপ্রাণতা ও মহানুভবতা লক্ষ্য করে তারা তাকে বিশ্বাস করতে শেখে ও গ্রামের সেবায় সহযোগিতা করে। রমেশের জেলে যাবার পর মুসলমান প্রজারা বেণী ঘোষালের উপর কিরূপ ক্ষুব্ধ হয়েছে গ্রাম্য চাষী সনাতন হাজরা তা শুনিয়ে দিয়েছে বেণীকে। রমার নাবালক ভাই যতীন রমেশের ভক্ত। রমেশের কার্যকলাপের সে-ও একজন উৎসাহী তরুণ। রমেশের এই মহৎ প্রচেষ্টা জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর চোখ থেকে এড়িয়ে যায়নি। তাঁকে বেণী ঘোষালের মা বলে চিনতে কষ্ট হয়। মা যে কি জিনিষ, তা বিশ্বেশ্বরীকে দেখলেই চেনা যায়। বাঙালী মায়ের সর্বংসহা মাতৃমূর্তি। রমেশের প্রেরণাদাত্রী। মুসলমান লাঠিয়াল আকবর আলি চরিত্রটির মধ্যে সততা ও নির্ভীকতার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। রমেশের লাঠিতে আহত হয়েও বেণী ঘোষালের নির্দেশে সে রমেশের বিপক্ষে আদালতে মিথ্যা বলেনি।

আর রমা? জমিদারির শরিকী দ্বন্দ্বে সে রমেশের বিরোধী। প্রথমে সে ভুল করে বেণী ঘোষালের সঙ্গে রমেশের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু রমেশের গ্রামোন্নয়ন কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়েছে, — সমাজ জীবনের সঙ্কীর্ণতা, ভালবাসার দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে। রমেশের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশীদার হয়েছে। রমা ও রমেশের প্রতি শরৎচন্দ্রের মমত্ব ও সমাত্মতা আমাদের স্নিগ্ধ করে। সমাজ হীনতা-

ীনতার মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের একটি কেবল মাধুর্য বিস্তার করে দেয়। "হৃদয়ের পথে কঙ্কালগুলি চলে, বাসর-রাতের দীপ নিভে গেছে বিধবা নয়ন জলে,"—তবু কান পেতে শোনেন—"জীবনের উন্মত্ত' কল্লোল'। রমার মধ্যে আমরা 'জীবনের উন্মত্ত কল্লোল' না শুনতে পেলেও জীবনের প্রেমের কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে পাই। 'পল্লীসমাজ' সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—"রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালেই কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ-জীবনে বিফল ব্যর্থ পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পেঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এতবড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, একথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেদিন বন্ধ হয়ে যেত।" (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)

শিল্পী শরৎচন্দ্র আশা ছাড়েন নি। কালনিরবধি ও বিপুলা পৃথিবী। যে সমাজ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনাকে পঙ্গু করে রাখে, সেই পঙ্কিল সমাজ ব্যবস্থা একদিন না একদিন শেষ হয়ে নব-জীবনের সমুদার অভ্যুত্থান ঘটাবে ; মাটিতে মায়ের মুখ,—সেই জীব-ধাত্রী পল্লীর মাটি সেই অনাগত শুভ দিনের জন্যেই উদগ্রীব। না হলে সাহিত্য সেবীর কলম চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যাবে। সত্যিই, 'পল্লী-সমাজ' শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা সমাজ-সচেতন সৃষ্টি। এ গ্রন্থের নাম-করণের মধ্যে শিল্পীর শিল্পচেতনা অপেক্ষা সমাজ চিত্রের প্রকাশ সিদ্ধ হয়েছে। উপন্যাসে রমা ও রমেশের জটিল মনস্তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক; জ্যাঠাইমা ও রমেশের কথাবার্তায় সমাজতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র স্পষ্ট

হয়ে উঠেছে। আগেই বলা হয়েছে type চরিত্রসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র অদ্বিতীয়, কিন্তু তৎকালীন সমাজে, বিশেষ করে গ্রাম্য সমাজে ক্ষুদে জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপ নিন্দনীয়। দলপতি বেণী ঘোষাল এরূপ একজন 'সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার'। বাক্ চাতুর্যে ও নিপুণ অভিনয়ে গ্রাম্য-মোড়লরা কত যে পারদর্শী, তার দৃষ্টান্ত গোবিন্দ গাঙ্গুলী। গোপন ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতা সাধারণ মানুষের চোখ এড়ায় না, অথচ প্রতিবাদ করার মত সৎ সাহস নেই। গরীব ব্রাহ্মণদের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া, রমেশের আত্মীয় সেজে স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা খুবই লজ্জাকর ও হাস্যকর।

শাশ্বত নারী চরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের তুলনা নেই, তা অবিসংবাদিত, আবার 'পল্লীসমাজের' মুখরা, নীচ মনোভাবাপন্না নারী চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি নিপুণ। রমার মাসী তাদের মধ্যে একজন। সে রমাকে কায়দা করে চালনা করার চেষ্টা করে, রমেশকে অপমান করতে তার মুখে আটকায় না— "যেমন বাপ, তেমনি ব্যাটা! বলা নেই, কহা নেই. একটা গেরস্তর বাড়ির ভিতর ঢুকে উৎপাত করতে সরম হয় না তোমার?" রমেশ মাসীর কথা শুনেই তো কাঠ। আবাব, এই গ্রাম্য সমাজে এমন নারীও আছে, যার কৃতজ্ঞতা-বোধ আছে। মাটির মমতার মতো দ্রবময়ী। ভৈরব আচার্যের স্ত্রী এমনই একজন নারী, সে স্বামীর কৃতঘ্নতাকে ঘৃণা করে, মেয়ের ভুল সংশোধন করে দেয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে রূপোপজীবিনীর বিচিত্র চরিত্র পেয়েছি, পেযেছি সহানুভূতি, পেয়েছি জ্বালা, কিন্তু গ্রামীণ পরিবেশে এমন সংহত মূর্তি খুবই কম দেখা যায়। আরেকটি type চরিত্র ক্ষ্যান্ত মাসি। এ এক প্রৌঢ়া রমণী। রমেশের পিতার শ্রাদ্ধের দিনে পরাণ হালদার প্রমুখ গ্রামের মাতব্বরের দল তার বিধবা মেয়ের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে, তখন ক্ষ্যান্ত মাসি ফাঁস করে দেয় তাদের গোপন খবর। "ক্ষ্যান্তি বামনিকে ঘাঁটালে ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে তা বলে দিচ্ছি।" তার চোটপাট জবাবে গ্রামের মাতব্বররা জব্দ হয়। শরৎচন্দ্র সামাজিক জীবনে পরিচিত এরূপ খণ্ড নর-নারীর পূর্ণাঙ্গ সত্তাকেই আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গোপন কামনা-বাসনা সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে চলে;

লোভ,, হিংসা, ঈর্ষা ও কূটৈষণা কৃমিকীটের মত মানুষের রক্তে কিলবিল করে, পশুতা ও স্বার্থপরতা শিকার সন্ধানী নেকড়ের মতো প্রতিক্ষায় থাকে। আবার সামান্য নারীর সামাজিক সত্তার অন্তরালে স্নেহ-মমতা ও প্রতিবাদের তুফান ওঠে। 'পল্লীসমাজ'-এ সেই রক্ত ক্ষরিত শক্তি ও সংঘর্ষ আভাসিত হয়ে উঠেছে।

তিন

শরৎচন্দ্র সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজালে হৃদয়াবেগকে বন্দী করে রেখেছিলেন, তাতে সামাজিক স্বাস্থ্য কতখানি সুস্থ হয়েছিল, তা' বিতর্কিত, কিন্তু ভালোবাসা অন্ধ, ভালোবাসা দুর্নিবার. ভালোবাসা আকাশের তারা, রাতের আঁধারে যেমন সে উজ্জ্বল, তেমনি দিনের আলোয় সে খুব স্পষ্ট না হলেও তার অস্তিত্বটুকু ফুরিয়ে যায় না। ''পল্লীসমাজের' রমা ও রমেশ-এর প্রেম তেমনি দুর্নিবার, তেমনি অন্ধ। এদের ভালবাসা লোকচক্ষুর অন্ত-রালে যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত, তেমনি আবার লোকাচারের স্পর্শ পেলেই তা আত্মগোপন করে। প্রেমের এই আত্মগোপনটুকু বড় মধুর। যে প্রেম প্রকাশ্য দিবালোকে অনুজ্জ্বল, সে প্রেমের অভিসার দুর্ভেদ্য সুড়ঙ্গ পথে। সে প্রেম নিষিদ্ধ কিন্তু অমর। মহান কবি Milton এর ভাষায় এ প্রেম—"The fruit of that forbidden tree"—নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল, আর নিষিদ্ধ বলেই তো এতো মধুর। বিধবা রমার প্রেম এমনই নিষিদ্ধ অথচ অমর।

বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীরাধাকে আয়ান ঘোষের পত্নীরূপে কল্পনা করে রাধা-কৃষ্ণের দিব্য-প্রেমকে অতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই অসামাজিক প্রেম, যা বৈষ্ণব সাহিত্যে পরকীয়া প্রেম বলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত, সেরূপ স্ফুরণ শরৎসাহিত্যে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও সেই নৈতিক শুচিতা-বোধের পরিচয় লক্ষণীয়। মনে হয়, তৎকালীন নৈতিক পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে রমা ও রমেশের মিলন ঘটাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বারংবার ইতস্ততঃ করেছেন। আমাদের মনে হয়, শরৎচন্দ্রের এই লোকভীতি তাঁর

উপন্যাসের প্রেমের আখ্যানকে পঙ্গু, নিবীর্য, প্লেতোনিক করে তুলেছে। শরৎচন্দ্রের নারীরা প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে বার বার পরাভূত হয়েছে। 'পল্লীসমাজের' রমাও সংস্কারের শৃঙ্খলে বন্দী। আসলে শরৎচন্দ্রের নারী পুরুষেরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। শরৎচন্দ্রের মনের অন্তরালে ছিল একটি শাশ্বত নারী ও একটি শাশ্বত পুরুষ। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিকে বিচার করলে দেখা যাবে—তাঁর সৃষ্টির ভিতরে দুটি উপাদান বিদ্যমান – একটি জীবনের বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা, আরেকটি তাঁর বাসনা সংস্কার। প্রত্যক্ষ বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা দিয়েছে তাঁর সৃষ্টির মালমশলা, আর হৃদয়স্থিত বাসনা সংস্কার দিয়েছে শিল্প সৌকর্যের বিশিষ্টরূপ। ভারতীয় চিন্তাধারায় লক্ষ্য করা যায় প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, কিন্তু পুরুষ চিরদিনই নির্গুণ। এই নির্গুণ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে যেন খুঁজে পাই আমাদের ছায়া-সুনিবিড় পল্লী-সংসারে। এখানেও যেন পুরুষ অনেকখানি নির্গুণ ভোলানাথ, নিজের জীবনযাত্রাটিতে ঠিক মত চালাতে পারে না, নারীর সাহচর্য ছাড়া অচল, আবার এই যে বিধৃতি রূপিনী নারী—, সেও পুরুষের সান্নিধ্য ছাড়া অচল। পুরুষের সান্নিধ্যে তার নিহিত সত্তার জাগরণ ঘটে। পৌরাণিক হর-পার্ব্বতীর চরিত্র দুটির মধ্যেও সেই বাস্তব-চিত্রের সন্ধান পাই। শিব-দুর্গা একে অপরের পরিপূরক, এক অপর ছাড়া অচল। আসলে, শরৎচন্দ্র প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যতই জেহাদ ঘোষণা করুন না কেন, নারী প্রকৃতির এই শাশ্বত রূপটি তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়েছিল। রমা ও রমেশের প্রকৃতিটি যেন এই ছাঁচেই ঢালা। রমেশ শিক্ষিত, উদার, মহান ও সাহসী কিন্তু বাস্তব জীবনে ছন্নছাড়া ভোলানাথ। নিজের স্বার্থ সে বোঝে না। রমা যেন বিধৃত রূপিণী—অন্তর ভরা প্রেম ও দরদ। এখানেই রমা ও রমেশের প্রকৃতিগত মিল। হয়তো বাইরে থেকে তাদের মিলন ঘটানো সম্ভব হয়নি, কিন্তু হৃদয়তন্ত্রী কোন কালেই ছিন্ন হবে না। রমা ও রমেশের প্রেম অমর। রমেশের জীবনে রমার জীবনের স্বপ্ন ন্যস্ত। রমেশের ভবিষ্যৎ শূন্য নয়—, তাই তারই হাতে তুলে দিয়েছে রমার বাৎসল্য কেন্দ্র ছোট ভাই যতীনকে—রমার পিতৃবংশের ভবিষ্যৎ।

জীবনে প্রত্যক্ষ মিলন না ঘটলেও তারা ভালবাসার বিনিময়ে একে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই বিনিময়ের তাৎপর্য লক্ষণীয়। সমস্ত হৃদয় যাকে চায় তাকেই দূরে ঠেলে দিতে হয়—বালবিধবার মনের এই নিরুপায় যন্ত্রণা, নিরুচ্চার আর্তি ঝরণার জলকল্লোলের মত পাঠককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্ববিরোধ সত্তার মতো তাঁর নায়ক-নায়িকার প্রেম ও স্ব-বিরোধী, রক্তক্ষরিত দ্বৈতবোধের খণ্ডিত চেতনা। তাই শরৎচন্দ্রের প্রেম-চেতনায় সামাজিক মূল্যবোধ ও শিল্পীর ব্যক্তিগত মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব খুবই স্পষ্ট ॥

চার

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ফর্মগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশে শরৎচন্দ্র নিতান্তই সহজ-সরল লেখক। প্রচলিত গল্প বলার উপরই তিনি নির্ভর-শীল। গল্প কথকের মতোই তাঁর ভূমিকা। প্লটের জন্য তিনি লিখতে-বসেন না। তাঁর পরম্পরাগত রক্ষণশীলতা, বর্ণাশ্রমী কাঠামোর প্রতি নিষ্ঠাই তাঁর উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর শ্রদ্ধা যাদের প্রতি—"তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা।' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখক শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিধবাদের প্রাধান্য সূচিত হয়। কারণ ঊনিশ-শতকের বাংলাদেশের যে দুটি সামাজিক আন্দোলন মধ্যবিত্ত সমাজের বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেই দুটিই বিধবাদের অধিকার নিয়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল,—তার প্রমাণও শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রতিফলিত। বিধবাদের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর করুণা ও সহানুভূতি ছিল, কিন্তু তারা বিধবাবিবাহকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, দোটানা মনোভাব শরৎচন্দ্রের মধ্যে সক্রিয় ছিল। ফলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ঐতিহ্যগত বিমূর্ত মানবিকতা চিত্রিত হয়েছে! একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, অভিজ্ঞতা থেকে জাত তার সৃষ্ট চরিত্র-গুলি খুবই বাস্তবসম্মত, আর সংলাপ নির্ভরতার জন্যই শরৎচন্দ্রের পাত্র পাত্রীরা পাঠকের সঙ্গে কথা বলে। উপন্যাসের উপাদান যত সামান্যই হোক না কেন, প্লট যা'ই-হোক না কেন, নরনারীর উক্তি প্রত্যুক্তি পাঠকদের কাছে নাটকের দৃশ্যের মতোই প্রাণবন্ত মনে হয়। তাঁর উপন্যাসের একমাত্র

উপাদান– মানুষ ও তার মন। বিশেষতঃ আবেগপ্রবণ বাঙালী মনন। নিজ উপন্যাসের কাঠামো সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"লিখতে বসলে প্লটের জন্য আটকায়? আমি কোন প্লট ভেবে লিখতে বসি না। একটা কোন চোখে দেখা সত্য ঘটনা অথবা ঘর সংসারের চিত্র নিয়ে সুরু করে দিই – তারপর কলম চলতে থাকে। তাতে যা হোক একটা কাঠামো দাঁড়ায়। তারপর যা স্বাভাবিকভাবে আসবার কথা তাই আছে। কোনো একটা বিচিত্র ব্যাপার বা ঘটনা জানি বলেই সেটাকেই জোর করে ঢুকোবার চেষ্টা করি না। এতে যদি প্লট না দাঁড়ায় তাতেই বা কি আসে যায়। আর কিছু হোক বা না হোক—বাঙালী জীবনের একটা চিত্র তো ফুটে ওঠে। তাহলেই সাহিত্য হলো যেখানে বাইরের ঘটনা জোটে, যেখানে ঘটনাকেই অবলম্বন করা যায়। যেখানে জোটে না, সেখানে মুখের কথায়, আচরণে, ব্যবহারে, হাবে ভাবে, চাল-চলনে চরিত্র ফোটে—জীবনও ফোটে; চরিত্রগুলি যে আমাদের মতই জীবন্ত। তাদের সময়শক্তি আছে, মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় আছে। তাদের মনের ভিতরে কি মহামারী কাণ্ডই না হচ্ছে। সেখানে ভাবের সঙ্গে ভাবের, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সংস্কারের কি কুরুক্ষেত্রই না হচ্ছে। মনের ভিতরকার যে ঘটনাগুলো বাইরের ঘটনার চেয়ে ঢের বেশী জীবন্ত, সেগুলোর কথা লিখলেই তো প্লটও হয়—সাহিত্যও হয়।" তিনি আরো বলেন—"আমার চরিত্রগুলিকে আগে চরিত্র হিসাবে কল্পনা করি, তারপর তাদের সিচুয়েশন-এ ফেলে রিঅ্যাক্ট করাই।"

শরৎচন্দ্রের উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি উপন্যাসকে চরিত্রের দিক থেকে দেখেন, প্লট সম্পর্কে ভাবেন না। কিন্তু কোন ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্লটকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না। বরং বলা যেতে পারে সুবিন্যস্ত প্লটই তাঁর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। প্লট তো ঘটনারই বর্ণনা। প্রত্যেক ঔপন্যাসিককেই প্লট ও চরিত্রের সম্মুখীন হতে হয়। তাই শরৎচন্দ্র চরিত্রের দিক থেকে প্লটকে সামলাতেন, কখনই কারণ নিমিত্ত চরিত্রকে ছাপিয়ে ব্যাখ্যা করেননি। যেমন—'পল্লীসমাজ'-এর রমা শেষ

পর্যন্ত গ্রাম ছাড়ে, শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যবাহী চিন্তার ফল, তবু প্লটটি যথেষ্ট। রমা গ্রাম ছেড়ে না গেলে উপন্যাসের বিস্তার আরো বাড়াতে হয় অথচ তা' সম্ভব নয়। তাই, শরৎচন্দ্র চরিত্রের কথা বড় করে ভাবলেও, প্লটকে আদৌ নিরপেক্ষভাবে ভাবতে পারেননি ; চরিত্রগুলিকে তিনি প্লটের সম্পর্ক সূত্রেই দেখেছেন।

পাঁচ

"পল্লীসমাজ"-এ চরম দলাদলি, কারসাজি, হানাহানি, লাঠালাঠি, শত্রুতা, দ্বেষাদ্বেষির পটভূমি অতি সূক্ষ্মভাবে শিল্পীর কলমে চিত্রিত, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, একে অপরকে হননের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত, সেখানে অপরের ক্ষতি ক'রে তবেই নিজের উন্নতি,—কে কতটা অন্যের ক্ষতি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তারই প্রয়াস দেখা যায়। অথচ এই (বুর্জোয়া) ব্যক্তিতান্ত্রিক মনোভাব কত মহৎ আদর্শ সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছে। রমা ও রমেশ চরিত্রের মধ্যে তারই দৃষ্টান্ত মেলে।

প্রথমতঃ—রমা চরিত্রটি একটু বিশ্লেষণ করা যাক। রমা ও রমেশের যখন অল্প বয়স, তখন থেকেই তারা পরস্পরের সুখদুঃখের অংশীদার। এর প্রমাণ মিলবে, রমেশের মা মারা যাবার পর রমার উক্তিতে – "কেঁদো না রমেশদা, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব।" আর, তাদের ভালোবাসার একমাত্র সাক্ষী বেণী ঘোষালের মা—বিশ্বেশ্বরী। রমার সঙ্গে রমেশের বিয়ে হয়নি, কারণ রমেশরা বড় কুলীন ছিল না। এই (বুর্জোয়া) ব্যক্তিতন্ত্র যা প্রত্যেকে নিজেকে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে! আর রমা ?— আজীবন সে রমেশকে ভালবেসেছে হৃদয়ের সত্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে ; কিন্তু সেই রমা ? রমেশের বিনাশের জন্য কত না চেষ্টাই করে এসেছে। এবং কেন ? কারণ সেও সমাজশিরোমণিদেরই একজন। তার নিজের self contradiction তাকেই তিলে তিলে ক্ষয় করেছে। বৈষয়িক স্বার্থে সামান্য মাছ নিয়ে ভজুয়ার সঙ্গে মিথ্যাচার শোভনীয় নয়। কুচক্রী বেণী ঘোষালের প্ররোচনায় রমা আকবর লাঠিয়ালকে পাঠিয়েছিল তাদের সখের বাঁধ রক্ষার জন্যে, তাতে রমেশের মৃত্যুও হতে পারে—রমা কি বুঝত না ?

ভজুয়াকে ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে হাজত পাঠানোর যেমন চক্রান্ত, তেমনি রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যও প্রস্তুতি – এ সবই হল আত্ম-ক্ষয়ী অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র। সমাজ ও মনুষ্যত্বের এই পরাভূত পরিণতিই শেষ কথা নয়। আরো গভীর জীবন আছে, আরো পূর্ণ মানবতা, আরো সার্থক সমাজচেতনা আছে। তাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্তিতন্ত্রী বা আত্মতন্ত্রী মানুষের অবক্ষয়ই কেবল দেখাননি, সেই আত্মগত মানুষ সমস্ত বিরুদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠে অম্লান সার্থকতায় একদিন পেঁাছাবে — এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। 'পল্লীসমাজ'-এ সেই শুভচেতনার ইঙ্গিত লক্ষণীয়। *তাই রমেশের মহাপ্রাণতা, সদিচ্ছা, গ্রাম গড়ার মহৎ কল্পনা সমাজ শাসনে-* একেবারে নিরর্থক হয়ে যাবে না। শরৎচন্দ্রের জীবনজিজ্ঞাসার সদুত্তর 'রমেশ'-এর সংলাপের মধ্যেই উচ্চারিত হয়েছে। যখন সে রমাকে বলে— "সেদিন আমার কেন জানি নে অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল, তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর,— কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। ভেবেছিলাম, কোনও কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছাওয়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব।" নায়কের মুখ দিয়ে শিল্পী জীবনের আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা, আর যন্ত্রণা উপচে উঠেছে। রমেশ শরৎচন্দ্রের মহৎ চরিত্র। রমেশ সত্যের শিলাসন খুঁজে পেয়েছে। সমাজের আঘাতে যে রমেশ ক্ষত-বিক্ষত, সেই রমেশ সমাজ-সেবায় সদাই আত্মস্থ। জেল থেকে ফিরে এসে রমাকে হারালেও মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। মাটির মমতায় রমেশ তার জীবনের মূল্য দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য—তারাশংকরের 'ধাত্রী দেবতা'-র শিবনাথ। কিন্তু শিবনাথ চরিত্রের complex রমেশ চরিত্রে নেই, অথচ রমেশের ছিল প্রশস্ত হৃদয়ের উদার ভালবাসা, সেবা ও ত্যাগে। রমা রমেশকে সমাজের ভয়ে নিজের গ্রাম হতে চলে যেতে অনুরোধ করে, অথচ সেই রমা শেষ পর্যন্ত রমেশেরই হাতে ছোট ভাইটিকে মানুষ করার ভার দিয়ে জ্যাঠাইমার সঙ্গে কাশীবাসী হয়। যেহেতু রমেশের ন্যায় নিষ্ঠা ও সততার প্রতি রমার বিশ্বাস ছিল। শরৎচন্দ্রের এই আশাবাদ নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয়।

গণচেতনা 'পল্লীসমাজে'র আর একটি প্লট। প্লটের মধ্যেই চরিত্রের ব্যাপ্তি ঘটেছে। রমেশের কৃষকশ্রেণীর প্রতি পরোপচীকির্ষা সত্যিই অর্থবহ। রমেশের মহাপ্রাণতায় শত্রুপক্ষের লাঠিয়াল আকবর আলিও মুগ্ধ। চাষীদের হয়ে রমেশ জোর করে বাঁধের মুখ খুলে দেয় রমার পাঠানো লাঠিয়াল বাধা দিতে গিয়ে রমেশের লোকজনের হাতে বেদম মার খায়। গণজাগরণে এই দৃশ্য সত্যিই লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, ভূমিহীন লাঠিয়ালদের শুভবোধের উদয়ও আশাপ্রদ। রমেশকে তারা চিনতে পেরেছে, রমেশের প্রতি এই সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের শ্রদ্ধা বেড়েছে; তাই বেণী ঘোষালের তাতানীতে আকবর লাঠিয়াল গলেনি। সে স্পষ্ট বলে দেয়—"কি কও বড়বাবু, সরম মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোক মোরে সর্দার কয় না? দিদি ঠাকরাণ (রমাকে উদ্দেশ্য করে), তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পারি ফেরেদি হব কোন কালামুখে? না, দিদি ঠাকরাণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে পারি না। ওঠারে গহর (ছেলেকে উদ্দেশ্য করে), এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতে পারব না।" (১১ পরিচ্ছেদ)।

চা২

আকবর লাঠিয়ালের এই সংলাপ সত্যিই অবিস্মরণীয়। রমেশের সংযম, নিষ্ঠা, ঘৃণ্য নীচতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পরোপচীকীর্ষা তার চরিত্রকে স্থিতধী করেছে, রমার আত্মীয় স্বজনের কাছে বারংবার অপমান ও রমার কাছে আঘাতের পর আঘাত পেয়েও রমেশের ভালবাসা ধ্রুব নক্ষত্রের মতো অম্লান ছিল।

পক্ষান্তরে, রমেশের প্রতি রমার প্রেম অন্তরের ও বাইরের বৈপরীত্যে জটিলতাপূর্ণ। কারণ, রমা ও রমেশের প্রণয় সমাজ-নিষিদ্ধ। বিধবা নারীর ভালবাসা উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়—; অথচ সে ভালবাসার সূচনা হয় ছোটবেলায়। রমার ভালোবাসার দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া উপন্যাসের গতিকে ত্বরান্বিত করে, কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রচন্ড টানা পোড়েনে রমার সত্তা দ্বিধাগ্রস্থ ও দ্বিখণ্ডিত। বাহ্য সত্তা তার

বৈষয়িক ও সমাজ অনুশাসিত সত্তা, আর অন্তর সত্তা—বিধবা রমার রমেশের প্রতি দুর্নিবার প্রেম। বৈষয়িক সত্তা রমেশকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, প্রেম সত্তা—রমেশের প্রতি তার অকৃত্রিম বিশ্বাস। সমাজ-অনুগত সত্তা রমেশকে জব্দ করেছে, জেলে পাঠিয়েছে, অপদস্থ করেছে। অথচ তারকেশ্বরের বাগানবাড়িতে রমেশকে একদিন কাছে পেয়ে বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে সেবা করেছে ও নিজ হাতে আসন পেতে খাইয়েছে। আবার রমেশের নিরাপত্তার জন্য আকুল হয়েছে ও ভালবাসার জোরেই ভৈরব আচার্যকে রমেশের ভয়ংকর ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছে এবং সর্বশেষে প্রেমের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তীর্থস্থানে যাত্রা করেছে। শরৎচন্দ্র নারীর প্রেমের দ্বৈত-সত্তার যে জটিল মনস্তত্ত্ব ও কার্যকারণ চিত্রিত করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর ও অনবদ্য। রমার জীবনের এই অনিবার্য বিপর্যয় ও পরিণতির জন্য মানবজীবনের অদৃষ্টের কথা মনে হয়। মানবজীবনের এই দ্বৈত সত্তার (two fold) কথা ঋষি টলস্টয়ও তাঁর 'war and peace' উপন্যাসে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন—"The life of man is two fold – one side of it is his personal experience, which is free and independent in proportion as his interests are lofty and transcendental, the other is his social life as an atom in the human swarm which binds him down with its laws and forces him to submit them."

টলস্টয়ের এই জীবনবোধ সার্বজনীন মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য। কেবলমাত্র রমার মধ্যে নয়—সকল মানুষের অন্তরালে শুভ-অশুভের, ভালো-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের দোলাচলবৃত্তি কাজ করে। এই দ্বৈধতাই রমার জীবনের tragedy ; ছ'মাস বিয়ের পর যে মেয়েটি বিধবা হয়ে পিতৃ-পুরুষের ভিটেতে চলে এল ; পৃথিবীর সমস্ত সাধ, আহ্লাদ, আরাম, আনন্দ থেকে বঞ্চিত হল, সেই বঞ্চিত মেয়েটি ভালবাসবার, স্নেহ করবার অবলম্বন চায়। শিল্পী শরৎচন্দ্র বিধবা রমার জন্যে করুণা ছাড়া আর কিছুই রেখে গেলেন না।

রমা ও রমেশের জীবন ঘটনার অচ্ছেদ্য শৃংখলে বাঁধা। মূল ঘটনার সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। আর বিশ্বেশ্বরী, রমা ও রমেশের জীবনের জাহ্নবীধারা—যাঁর অমৃতধারায় তারা দুজনেই তৃপ্ত। ভারতীয় নারীর সহনশীলতা ও স্নেহশীলা মাতৃমূর্ত্তি রূপটি ফুটেছে বিশ্বেশ্বরী চরিত্রে। তিনি রমেশের সান্ত্বনার আশ্রয়। আঘাতে-সংঘাতে দিশাহারা রমেশের সম্মুখে ধ্রুবতারা, যারা আলোয় সত্য ও সুন্দরের কথাটি আলোচিত। 'পল্লী-সমাজের ঘৃণ্য নরককুণ্ডের বুকে এরূপ শুচিশুভ্র, সত্যবতী নারী সত্যিই বিরল। রমা ও রমেশের প্রতি তার ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ সত্যিকার মায়ের মতন। তিনি কি সত্যিই সমাজ-নেতা কুচক্রী বেণী ঘোষালের মা? না, তিনি সর্বংসহা বাঙালী মায়ের প্রতীক। পাপপুণ্যের, ন্যায়-অন্যায়ের নীরব সাক্ষী। শ্রদ্ধেয়া রাধারাণী দেবীর মাতৃত্বের সত্যোপলব্ধি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—"শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যথার্থ মহৎ মাতৃত্ব ফুটেছে পরের সন্তানকে ঘিরে। মাতৃত্বের বৃত্তিকে তিনি জৈবিক স্তর থেকে উপরে টেনে তুলে মানবিকতায় আলোকিত করে দিয়েছেন। নারীর মধ্যে যে 'মা' আছে, তার বিকাশের জন্য জরায়ুতে সন্তান ধারণের প্রয়োজন হয় না।"—('শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প')। তাই বিশ্বেশ্বরী শুধু বেণী ঘোষালের মা নয়, সে আত্মভোলা রমেশেরও মা। বিশ্বেশ্বরী চরিত্রটি রমা ও রমেশের জীবনের পরিপূরক।

নারীজাতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না। 'পুরুষের আত্মবিস্মৃত পৌরুষ বা আত্মনাশী শক্তিকে প্রাণের উষ্ণ আশ্রয় দিয়ে, কল্যাণ-পরিণামী শান্ত সৌন্দর্যে ভরে তোলার এক অমেয় অমৃত সত্তার অধিকারিনী অন্নপূর্ণা রূপে তিনি নারীকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণা। তিনি রমেশকে সারাজীবন প্রাণের উষ্ণ আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। রমেশের পিতার শ্রাদ্ধের উদ্যোগের সময়ে মাতৃপিতৃ-হারা রমেশের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং জিনিষপত্রের অপচয় থেকে রমেশকে রক্ষা করার জন্য ভাঁড়ারের চাবি নিজেই রেখে দেন; বিশ্বেশ্বরী রমেশকে বলেন—"ছি বাবা, এসময়ে শক্ত হতে হয়।" রমাকে জ্যাঠাইমা কন্যার

মতই স্নেহ করতেন। ধর্মপরায়ণা নারীর নিজ সন্তানের কুকর্মের জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

সাত

রমা-চরিত্র 'পল্লীসমাজ'-এর মূল চরিত্র। রমা জীবনে সার্থকতা পেল না। রমার প্রেম পূর্ণতা লাভ করল না। রমা ও রমেশের ছেলে-বেলার ভালোবাসা বিবাহ বন্ধনে গ্রথিত হল না। রমার জীবনে এত বড় ট্রাজেডির জন্য দায়ী কে? সমাজব্যবস্থা? না, মূল কৌলিন্য নিয়ে মুখুয্যে বংশের সঙ্গে ঘোষাল বংশের শত্রুতা? কিংবা সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে পরস্পরের দম্ভস্ফীত ঔদ্ধত্য? না, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ফল? রমার ঔদ্ধত্যের কথা কারো অবিদিত নয়,—রমেশের বাবার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সে বেণী ঘোষালকে বলেছে—"আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ীতে?" কিংবা সমাজশক্তির ভয়ে কি সে রমেশকে জেলে পাঠায়? রমা কি সমাজপতিদের ক্রীড়নক. না পুতুল? যদু মুখুয্যের মেয়ে বলে বংশগৌরবে গৌরবান্বিতা? তথাপি রমা সত্যিই রমেশকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস রাখে। তাই যতীনের কাছ থেকে রমেশের খবর নেয়। রমা কঠিন বর্ম দিয়ে অন্তরের ভালবাসার ফল্গুধারাকে আটকে রেখেছিল মাত্র, তাই লোক-দেখানো রমেশের বিরুদ্ধাচরণ, প্রেমাস্পদের প্রতি শত্রুতা, রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে জেলে পাঠানো পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। কারণ পাঠক জানে—রমার চরিত্রে এই সমস্ত আপাতবিরোধ, তা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছু নয়। রমার তীব্র মনোযন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে তার কথায়—"আমরা যা করে তাঁকে জেলে পুরে দিয়ে এসেচি, সে ত কারো কাছেই চাপা নেই।" তবে রমেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া, তার সম্পত্তি রমেশকে দান করার সিদ্ধান্ত, পিতৃপুরুষের বংশধর যতীনকে রমেশের হাতে সমর্পণ প্রভৃতি কার্য-কারণের মধ্যে যতখানি মন ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল হৃদয়াবেগ। ফলে, রমার জীবনের গভীর অনুভূতির বিকাশ শিল্প-রূপ লাভ করেনি। রমার আত্মকেন্দ্রিক দুর্গের ভিতরে রমেশ কোনদিনই প্রবেশাধিকার পায়নি। রমা ও রমেশ একবারই খুব কাছাকাছি এসেছিল

তারকেশ্বরের রমার বাড়ীতে। রমেশের ছেলেবেলার 'রাণী'র মুখ মনে পড়েছিল। এই আবেগমধুর দিনটি কোনদিনই হয়তো তারা ভুলতে পারবে না। এখানেও তাদের কথাবার্তায় মধ্যে প্রেমিক রমেশ অপেক্ষা আদর্শবাদী, উদার, প্রাণবান, সমাজসেবী রমেশকে খুঁজে পাওয়া যাবে। রমা বলে—'পরের কাজে আপনার আলস্য দেখিনে ?' রমেশের উত্তর—'পরের কাজে আলস্য করলে ভগবানের কাছে জবাব দিহিতে পড়তে হয়। নিজের কাজেও হয়ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অত নয়।' এরপর, তাদের দুজনের মাসখানেক পরে দেখা। একশ বিঘের মাঠ ডুবে গেছে; জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে। রমেশ জল বার করে দেবার জন্যে রমার মত নিতে এসেছে। বছরে দু-শ' টাকার মাছ বিক্রীর জন্য এটা বেঁধে রাখা হয়েছে। রমা বলে—'অত টাকা লোকসান করতে পারব না।' রমেশ জ্বলে ওঠে। রমেশ বলে—'রমা, মানুষ খাঁটি কিনা, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে।' রমা ও রমেশের পার্থক্য এখানে। রমেশ গ্রামের জাতিবর্ণ নির্বিশেষে কৃষকদের উন্নতিকল্পে অটল। রমার প্রতি তার অগাধ আস্থা ছিল, কিন্তু পল্লীসমাজের পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তে রমার মতো মেয়ে কত নীচ হয়ে গিয়েছিল তারই চিত্র অঙ্কিত করেছেন শরৎচন্দ্র। রমেশ জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেয়, আর রমা পীরপুরের প্রজা আকবর লাঠিয়ালকে পাঠায় রমেশকে জব্দ করার জন্য। রমার কাছে, আঘাতের পর আঘাত খেয়ে রমেশ কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি, বরং অটল। রমেশ সম্মুখে মাথা তুলে কর্তব্য পালন করেছে। রমা ও রমেশের প্রেম তাই ঘাত প্রতিঘাতে, অনুরাগ-বিরাগে, আকর্ষণ-বিকর্ষণে, ভুল-প্রাপ্তির মধ্যে দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। শরৎচন্দ্র যেহেতু নারীত্বের অপমান করেননি, সেইহেতু রমার প্রবল নারীত্বের মহিমা অবশ্যম্বীকার্য। রমা একদিকে তেজস্বিনী ও অন্যদিকে স্নেহশীলা নারী রমেশ সংযমী ও উদার প্রকৃতির পুরুষ। একে অপরের পরিপূরক। রমা ও রমেশের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—'রমেশ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সাহসী উদার, মহান ; কিন্তু নিজের জীবনে সে যেন কেমন উদাসীন,— নিজের

দিকে যেন তাহার কোনও দৃষ্টিই নাই; শুধু অকাতরে সে আপনাকে বিলাইয়া দিতেছে। নিজের স্বার্থ সে বোঝে না,—বুদ্ধির অভাব নহে,—শুধু নিজের পানে তাকাইয়া দেখিবার ধাতটিই দেন নাই বিধাতাপুরুষ তাহার ভিতরে। তাহার বাপ নাই, মা নাই,—সেই যেন অনেকখানি ছন্নছাড়া ভোলানাথ জীবন। থাকিবার ভিতরে আছে শুধু বিরাট প্রাণ, সংসারের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা যাহাকে সহসা স্পর্শ করিতে পারে না। আর এই রমেশেরই ঠিক বিপরীত প্রকৃতির লোক বেণী ঘোষাল। রমা যেন সংহতিরূপিনী—ধৈর্য, সংযম, তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি,—অন্তরভরা তাহার প্রেম ও দরদ। এখানেই রমা ও রমেশের প্রকৃতিগত মিল এবং এই মিলন—ডোরে বাহির হইতে আঘাত লাগুক,—তাহা কখনই একেবারে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে নাই।" ('শরৎসাহিত্যের শাশ্বত নারী ও পুরুষ')।

আট

"আর এই রমেশেরই ঠিক বিপরীত প্রকৃতির লোক বেণী ঘোষাল"। typical উচ্চবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি। এদের লজ্জাসরম নেই, বিবেক নেই, সামান্যটুকু আত্মমর্যাদাবোধ নেই। তখনকার দিনে বেণী ঘোষালের মতো স্বার্থপর, নীচ, সংকীর্ণচেতা জমিদার প্রায়ই দেখা যেত। আবার পারিষদবর্গ তার চেয়েও সংস্কারাছন্ন, অন্ধ; বিচার-আচারের সীমাবদ্ধ গন্ডীর মধ্যে বন্দী। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে বিলাস-সম্ভোগের স্বপ্ন দেখে। লালসার ক্ষুধা, আদিম প্রবৃত্তির তাড়না তাদের পরিচালিত করে। উদার, পরোপকারী, আধুনিক শিক্ষায় পরিমার্জিত রমেশের সঙ্গে কুচক্রী বেণী ঘোষালের সংঘর্ষে শিল্পীর বিশিষ্ট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রমেশ নতুন সমাজের কর্ণধার; বেণী ঘোষাল পুরাতন সমাজের প্রতিভূ। নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে পুরাতনের পরাজয়ে শিল্পীর প্রগতিশীল চিন্তার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রাম্যসমাজের কদাকার, কুৎসিৎ রূপ উন্মোচনে শরৎচন্দ্রের মতো শিল্পী খুবই বিরল, কিন্তু সেই সমাজের প্রতিনিধি চরিত্র অংকনেও তাঁর মন আরো বেশী সচেতন ছিল। শরৎচন্দ্রের মুক্তি-সচেতন মন

এসত্য জানতো যে একদিন সেই শুভদিন আসবেই, যেদিন নতুনের আবির্ভাবকে প্রতিহত করবার শক্তি কারো থাকবে না। সুতরাং, রমেশের আবির্ভাবকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ক্রমাবক্ষয়ী পুরাতন সমাজের প্রতিভূ বেণী ঘোষালের ছিল না। তাই, রমেশ জেল থেকে ফিরে আসার পর বাঁচার তাগিদে মান-সম্ভ্রম খুইয়ে রমেশের দলে ভিড়ে যেতে বেণী দ্বিধাবোধ করে নি। এতো নতুনেরই জয়। শিল্পী শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানেই। শরৎচন্দ্র এইভাবেই অপ্রধান চরিত্রগুলির সাহায্যে মূল চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের বিস্তৃত রূপায়ণ করেছেন। অন্যদিকে, বেণী ঘোষাল রমাকে পরিচালনা করতে চেয়েছে। বংশগত, সংস্কারগত ও উত্তরাধিকার সূত্রে সমাজের মাতব্বর সেজে বসে আছে, তার পৃষ্ঠপোষক অনেক, যেমন গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার প্রমুখ ধুরন্ধর শ্রেণীর স্তাবকেরা। টাইপ চরিত্রের বৈচিত্র্যে এক একটি চরিত্র শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি। এরা সকলেই অতীতের প্রতি বিশ্বাসী এবং রমেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে বেণী ঘোষালের কদর্যতা অবিস্মরণীয়। কয়েকটি চিত্রেই তার পরিচয় মিলবে :— (এক) মুখুজ্যে ও ঘোষালদের বাঁধের মুখ খুলে দেওয়ার জন্য কৃষকদের হয়ে বেণী ঘোষালের কাছে রমেশ অনুরোধ করলে বেণীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য চমৎকারে প্রতিফলিত হয়। বেণী বলে— চাষীদের ধানের দাম পাঁচ হাজারই হোক, আর পঞ্চাশ হাজারই হোক, "ও শালাদের জন্যে' তার হকের দুশো টাকা মাছের দাম কোনমতেই ছেড়ে দিতে পারবে না। রমেশ বলে—"তবে চাষীরা খাবে কি ?" বেণী ঘোষাল মুখ বিকৃত করে বলে— "খাবে কি ? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্দক রেখে আমাদের কাছে টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ···ওরা খাবে কি ? ধার কর্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন ?"

(দুই) গ্রামের চাষী সনাতন হাজরা রমা ও বেণী ঘোষালকে শুনিয়ে দিয়ে যায়—"ঠাকুরের সুমুখে মিথ্যা বলচি না বড়বাবু, একটু সামলে-সুমলে থাকবেন"। বেণীর ক্রুদ্ধ মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সনাতন আরো বলে—'ছোটবাবু ফিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে তা ঐ মা দুর্গাই

জানেন। এর মধ্যেই দু-তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চারপাশে ঘুরে ফিরে গেছে"। সনাতনের কথা শুনে বেণী ঘোষাল খুবই ভয় পেয়ে যায়, বলে, 'ব্যাপার শুনলে রমা?' রমা শুধু একটু মুচকে হাসে। রমার হাসি দেখে বেণীর গা রাগে জ্বলে যায়। খিস্তি করে বলে—'তুমি ত হাসবেই রমা, মেয়েমানুষ, বাড়ির বার হতে ত হয় না; কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যিই যদি একদিন আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেয়? মেয়েমানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়'। বেণীর এরূপ নির্লজ্জ আচরণে রমা মোটেই আশ্চর্য্য হয়নি; কারণ রমা বেণীকে ভালমতোই চিনতো।

(তিন) ছ-মাস সশ্রম কারাদন্ডের পর যেদিন রমেশ মুক্তি পেল, সে দিনের ঘটনাটি অচিন্তনীয়। স্বয়ং বেণী ঘোষাল মাথায় চাদর জড়িয়ে সবার আগে দাঁড়িয়ে আছে। সজোরে আলিঙ্গন করে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে —"রমেশ ভাইরে, নাড়ীর টান যে এমন টান, এবার তা টের পেয়েছি। যদু মুখুয্যের মেয়ে যে আচায্যি হারামজাদাকে হাতে করে এমন শত্রুতা করবে, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে আমি তখন জানতে চাইনি, ভগবান্ তার শাস্তি আমাকে ভালমতোই দিয়েছেন।"

উপরিউক্ত সংলাপ ও ঘটনার মধ্য দিয়ে বেণী ঘোষালের চরিত্রটি আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছে।

রমেশ ও রমার প্রতি এরূপ আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে বেণীকে একজন নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বলে মনে হয়। তার মতো ভন্ড, সুবিধাবাদী, তোষামোদে, অমার্জিত মানুষ শরৎসাহিত্যে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। বেণী ঘোষালের সামান্যতম culture নেই, যার আলোকে সে তার আবেগকে পরিশীলিত করতে পারে, কিংবা দেহের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনাকে সংযত করতে পারে। সে প্রায়ই উচ্চকন্ঠে কথা বলে। তার আচরণে extreme character-এর লক্ষণ সুস্পষ্ট। নিজের মায়ের প্রতি ঔদ্ধত্য অমার্জনীয়। বেণী ঘোষাল কি সত্যিই যন্ত্র? মানবচরিত্রের এমন কোন

বৈচিত্র্য তার চরিত্রে মিলবে না ? অবক্ষয়ী সমাজের প্রতিনিধি চরিত্রের মধ্যে তেমন কোন বৈচিত্র্যের পরিচয় না পাওয়া গেলেও নানা অবস্থার বিপাকে তার দুর্বিনীত ও ক্রুদ্ধ আচরণ, প্রতিশোধ স্পৃহা, দলবাজি, হননের প্রবৃত্তি-র মধ্যে তার আসল পরিচয় পাওয়া যায়। বেণী ঘোষালের প্রতি কারো মমতা নেই, করুণা নেই – মা বিশ্বেশ্বরীর নেই ; রমার নেই ; গ্রামের মানুষের নেই। তাহলে, বেণী ঘোষাল বাঁচবে কি নিয়ে ? অতীতের ধারক ও বাহক বেণী ঘোষাল যাবেই। তাকে ধরে রাখা যাবে না। পুরা-তনের পরাজয় নিশ্চিত জেনেই রিয়ালিস্টিক শরৎচন্দ্র বেণী ঘোষালের শুভ-বোধের উদয় ঘটিয়েছেন এবং রমেশ জেল থেকে ফিরে আসার পর বেণী রমেশের দলে ভিড়ে যাওয়ার মধ্যে ভবিষ্যতেরই জয় ঘোষণা করেছেন। সম-লোচকরা মনে করেন এ হৃদয়াবেগ ছাড়া কিছুই নয়। সত্যিই তাই। এই হৃদয়বৃত্তিই মানুষের সবচেয়ে বড় বালাই। কারণ মানুষ সম্পূর্ণভাবে পশু নয়। 'Love comes and the beast dies' – , অনুরূপ বেণী ঘোষাল একেবারে পশু নয়। পশুর মর্মস্থলে প্রেমের মৃত্যুবাণ বিঁধিয়ে শরৎচন্দ্র শুভবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করেছেন। বেণী শুধু আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের উদ্দেশ্যেই রমেশের সঙ্গে ভিড়েনি। হৃদয়-বৃত্তির তাগিদেই সে রমেশকে গ্রহণ করেছে। শরৎচন্দ্রের শিল্পীচেতনার একটি নির্ভুল নিদর্শন বেণী ঘোষাল।

নয়

শরৎচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টির মতো তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কথায় বলে—"style is the man himself"—শরৎচন্দ্রের রচনার style টি অনবদ্য। style এর মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া, বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে style এর সম্পর্ক অতি নিবিড়। শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা ধরা পড়ে তাঁর রচনার ভঙ্গী ও বক্তব্যে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি অভিজ্ঞতা, মনন ও রচনারীতির প্রয়োগে অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। style এর দর্পণে গোটা মানুষটির প্রতিবিম্ব আমাদের চোখের

সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শিল্পীর style ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন হলেও সার্বজনীন : "style in this absolute sense is a complete fusion of the personal and the Universal."

শরৎচন্দ্র পল্লী-জীবনের ভাষ্যকার হলেও নাগরিক মেজাজের শিল্পী। বৈদগ্ধ্য, মননশীলতা, সংবেদনশীলতা তাঁর রচনাকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। তাঁর ভাষা জলের মতো স্বচ্ছ। পরিমার্জনা ও পরিশীলন তাঁর রচনাকে অনুপম শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছে। তাঁর ভাষা সহজ, সরল, প্রাণবন্ত। যে সব মানুষের মন নিয়ে তাঁর কারবার—তাদের মেজাজ ও আবেগের ভাষাসৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর রচনা করুণরসাত্মক হলেও সংযম ও পরিমিতি বোধ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। তিনি জীবনের পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সত্যাসত্য, সুন্দর-অসুন্দরের যে-রূপ যেমনভাবে দেখেছেন, তারই প্রতিচ্ছবি অংকন করেছেন। তিনি সচেতন ও সংযত শিল্পী ছিলেন। ভাষা বুননে এমন নিপুণ কারিগর বংকিম ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলার কথা-সাহিত্যে খুবই বিরল। হয়তো, মহান অ্যারিস্টটল এর কথা তাঁর মনের কোণে প্রতিধ্বনিত হত—"It must be clear, but it must not be mean." বাস্তবিক, শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলী জলের মতো স্বচ্ছ, অথচ শিল্পসৌকর্যে অনবদ্য।

মানব মনের রহস্য উদঘাটনের জন্য শরৎচন্দ্রের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। বিশেষত, শাশ্বত নরনারীর হৃদয়রহস্যে প্রবেশ করে তার গোপন সত্তাকে বৈজ্ঞানিকের মতো আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। বোধহয়, সেই কারণে তাঁর উপন্যাসে ভাবাবেগ থাকা সত্ত্বেও তা পরিমার্জিত ও মধুর।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের রচনাশৈলীর আশ্চর্য সুষমা পাঠককে মুগ্ধ করে। অটল সংযমের কঠিন ভূমিই হল পল্লীসমাজের ভিৎ। রমা রমেশ ও বিশ্বেশ্বরীর দৃঢ় সংযমের ভিত্তির উপরেই পল্লীজীবন অবস্থিত। রমা ও রমেশের ভেতরের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের ঢেউ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। শরৎসাহিত্য যৌনসংযম অবিসংবাদিত। তাছাড়া, লেখার

সংযমও সাহিত্যের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমা ও রমেশের সংলাপে বা কথোপকথনে যেমন আশ্চর্য বাক্-সংযমের পরিচয় পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি লেখকের বর্ণনায় অনুরূপ আশ্চর্য পরিমিতিবোধ লক্ষ্য করা যায়। একটি উদ্ধৃতির মধ্যেই তার প্রমাণ যথেষ্ট হবে,—যেমন 'তবে মন্দিরের বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি পুজোটা সেরে নিই। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব, বলিয়া মেয়েটি মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। রমেশ মুগ্ধের মতো চাহিয়া রহিল। একি ভীষণ উদ্দাম যৌবনশ্রী ইহার আর্দ্র বসন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল। তাহার মুখ, গঠন প্রতি পদক্ষেপ পর্যন্ত রমেশের পরিচিত. অথচ বহুদিন রুদ্ধ স্মৃতির কবাট তাহাকে কোন মতেই পথ ছাড়িয়া দিল না।" —রচনা সৌষ্ঠবে যেমন অনবদ্য, তেমনি অপরূপ ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। নায়িকার রূপবর্ণনায় শিল্পীর কৌশলও সুস্পষ্ট। জাত কলাকুশলীর মত স্বভাবসিদ্ধ সংযমে বিধবা রমার দেহ সৌষ্ঠবের বর্ণনা করেছেন। বিশ্বেশ্বরীর সর্বংসহা রূপের মধ্যে তাঁর বাক্-সংযম অনবদ্য—তিনি রমেশকে বলেন—"তাকে তুই যেন ভুল বুঝিস নে। যাবার সময় আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমায় তুই ভুলেও অবিশ্বাস করিস নে যে, তার মত বড় মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিনী তোর আর কেউ নেই।" শব্দের বুনোনি ও অল্প কথায় অধিক ভাবপ্রকাশের এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই দুর্লভ।

শরৎচন্দ্রের style তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই তাঁর রচনায় মানবতাবোধ এত গভীর ভাবে ব্যাপ্তি লাভ করেছে ও হৃদয়ের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। গঠন ও বাক্য নির্মাণে লেখকের শিল্প সচেতনতা অনায়াসলক্ষণীয়। বিশ্বেশ্বরীর উপরিউক্তির মধ্যে কথ্য ভঙ্গির প্রবণতা প্রাধান্য পেয়েছে। ধ্বনি সচেতন কথাশিল্পী অতি সতর্কতার সঙ্গে বাক্য-বিন্যাস তৈরী করেন। বিশ্বেশ্বরীর রূপ বর্ণনায় শিল্পী শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতির সাবলীলতা, মাধুর্য, স্বচ্ছতা ও লাবণ্য দারুণ কাব্যগুণ-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে : "আজও সেই কাঁচা সোনার বর্ণ। একদিন যে রূপের খ্যাতি

এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য তাহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, সুমুখেই দুই-একগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক, কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট সবগুলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহু যত্নের বহু সাধনার ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য তাঁহার দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি। সেদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে সমস্ত অন্তঃকরণ যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আসিতে থাকে।" বর্ণনার মধ্যে শরৎগদ্য-রীতির উৎকর্ষতা পরীক্ষিত হয়েছে। তৎসম শব্দের উপযোগিতা পদবিন্যাসে অভিনবত্ব এনেছে। ক্রিয়াপদ ও নামধাতুর ব্যবহারে বাক্যে বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। উপমা, বিশ্লেষণ প্রয়োগে তাঁর সতর্কতা অনায়াসলক্ষণীয়। শরৎচন্দ্র জনগণের শিল্পী, তাঁর ভাষার বাহন ছিল জনচিত্তজয়ী। গদ্যরচনায় রবীন্দ্র-শিষ্য হয়েও শরৎচন্দ্রের style স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ।

শিশু চরিত্র

হৃদয়ের গভীরে শিশু যে কখন নিজের আসনটি অধিকার করে নেয়, তা' আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারি না। যখন উপলব্ধি করি, তখন বুঝতে পারি শিশুর নিবিড় মাধুর্যে অনেক বড়ো বড়ো বস্তুও মনের কোন থেকে দূরে ঠেলে দেয়। শিশু-সান্নিধ্যে মানবজীবন বিশালতার সন্ধান পায়। কারণ, শিশুর মনে অন্তর্নিহিত আছে প্রকৃতির 'প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য'। আবার, শিশুই হচ্ছে অখণ্ড বিশ্বচৈতন্যসত্তার (Universal consciousness) অংশবিশেষ। বিশ্বের সকল বস্তুর সারসত্তা হ'চ্ছে—শিশু। শিশু সত্যিই অন্তর্লোকবাসী। বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মতো শিশু-জীবনও বৈচিত্র্যময়। শিশুর মধ্যে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, পর্বতের প্রশান্তি, তরুলতার মর্মরতা, পাখির কলরব, পশুর ক্রূরতা প্রভৃতি লক্ষণ-গুলি দেখা যায় ; তেমনি শিশুর মধ্যেই আকাশের আলোকাভিসার, নদী ও ঝর্ণার অফুরন্ত কুলু কুলু স্বর পরিলক্ষিত হয়। শিশুর বিকাশ প্রকাশে উন্মুখ। বিশ্ববিশ্রুত মার্কিন কবি Watt Wittman-এর সেই বিখ্যাত কবিতার কথা অনেকেই জানেন—"There was a child went forth everyday"—অর্থাৎ একটি শিশু-হৃদয় প্রত্যহ বেরিয়ে পড়তে চায়। 'সে যাই দেখে, তা'তেই মনে হয়—প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণ-চ্ছটা, পুষ্পের সৌন্দর্য, বিহঙ্গের কাকলী, ফলশস্যের বিচিত্র সম্ভার ; শহরের রাজপথের লোকারণ্য, গৃহের পিতামাতা আত্মীয় স্বজন—সকল দৃশ্য, শব্দ, ভাব, অনুভাব – তার অঙ্গীগত – অংশীভূত। সে প্রত্যহই এই সব গ্রহণ করে, সে প্রত্যহ বেরিয়ে আসতে চায়—'went forth every-body'—এই অভিব্যক্তিই পৃথিবীর সকল শিশুর মধ্যে বিদ্যমান। বিশ্ব বিখ্যাত বিবর্তনবাদী Darwin-এর ভাষায় বলা যায়—শিশু যেন একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ—"An organic being is a microsm, a little universe, formed of a host of self propaga-ting organism, the concevably minute, and

humerous as the stars in heaven'। আর রবীন্দ্রনাথ বলেন—এই শিশুর 'বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া'। বাস্তবিক, শিশুর মধ্যে যেমন একদিকে বিশ্বসত্তার অধিষ্ঠান, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিসত্তার স্বতন্ত্র বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্মৃতি, সংস্কার এবং রাগ-অনুরাগ-বিরাগ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি লক্ষণীয়।

শরৎচন্দ্রের শিশু বা কিশোর চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ বা বিভূতিভূষণের মতো আত্মিক বেদনা থেকে জাত নয়, প্রকৃতিলোকের নিকটবাসী নয়। মানুষের মনের ছোট ছোট অনুভূতির রহস্যই শরৎচন্দ্রকে বেশী আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বলাই বা বিভূতিভূষণের অপুকে সকলে চেনেন, এরূপ প্রকৃতিরস ও মানবরসজারিত চরিত্র শরৎসাহিত্যে প্রত্যাশা করা যাবে না। শরৎচন্দ্রের শিশুরা সামাজিক জীবনের বলি, অভাব অনটনে জর্জরিত ; এক ফোঁটা দুধের জন্য কাঙাল, সামান্য বাতাসার জন্যে পাগল, একটা লাটাই-এর জন্যে অস্থির ; আবার বুড়োর দাবা খেলার সঙ্গী, বড়োদের সুখ-দুঃখের অংশীদার, মানবতার অগ্রদূত। কখনো সে অবুঝ, কখনো সে অভিমানী, কখনো যে স্নেহে অন্ধ। 'দত্তা' উপন্যাসের পরেশ, 'পল্লী-সমাজের' যতীন, 'রামের সুমতি'-র রামলাল, 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের বিশু দাদা, 'পণ্ডিত মশাই' গল্পের চরণ, বিন্দুর ছেলে'র অমূল্য, 'মেজদিদি' গল্পের কেষ্ট, 'মহেশ' গল্পের আমিনা, 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালী-চরণ, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, 'বৈকুন্ঠের উইল' এর গোকুলের মতো চরিত্র অঙ্কনে যেমন শিশু মনস্তত্ত্ব সবিশেষ বিশ্লেষিত হ'য়েছে, তেমনি দুষ্টপ্রকৃতির কিশোরচরিত্র অঙ্কনেও তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা অনস্বীকার্য। যেমন 'নিষ্কৃতি'র অতুল, 'রামের সুমতির' রামলাল, 'লালু' গল্পের লালু, সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কোলকাতায় নূতনদা প্রভৃতি চরিত্রগুলি। শরৎসাহিত্যে যে পরিমাণ শিশুরা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে, তাদের একত্রে জড়ো করলে মনে হবে শিশুর মিছিল চলেছে। নানা আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, অভিযোগ, ক্ষোভ অভিমান নিয়ে তাদের দরবার। শিশুর অনুভূতিগুলি বড়ো মানুষের মতোই বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিশুর কার্যকলাপ বিজ্ঞ মানুষের মতোই পরিণত।

শিশুর সম্ভ্রমবোধ বয়স্ক লোকদের মতই সচেতনতাপূর্ণ।

মহান প্রেম শরৎচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ সাধনে সহায়তা করেনি, অথচ স্নেহ শরৎচন্দ্রকে পূর্ণতা দান করেছে। কিশোর ও শিশুদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা, দরদ সহজাত ও রক্তক্ষরিত। সামান্য একটু স্নেহের অভাবে কত সুকুমারমতি শিশু অকালে নষ্ট হয়ে যায়, তারই ইতিবৃত্ত তিনি রচনা করেছেন। শিশুর স্নেহকে নিয়েই তাঁর গল্পের বা উপন্যাসের প্লট প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 'রামের সুমতি' গল্পে রামের জন্য নারায়ণীর স্নেহ-মমতা, আবেগ ও বেদনা যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির দিগন্তকে প্রসারিত করেছে, তেমন নারায়ণীর প্রতি কিশোর রামের অপ্রতিহত স্নেহ সর্বশক্তিমান। 'স্নেহ সুধামাখা বাস গৃহতল আরো আপনার' হয়ে উঠেছে মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া ও পুত্রসম দেবরের নিবিড় সম্পর্কে। এই পনেরো-ষোল বছরের ছেলেটি বুকের গভীরে দারুণ যন্ত্রণা ছিল। আজীবন স্নেহ বঞ্চিত এই কিশোরটি অল্প বয়সেই মাতৃ-পিতৃহারা। এমনই একটি শিশু রামলাল যে শিশুকাল থেকেই স্নেহ-মমতার কাঙাল। যদিও নারায়ণীর স্নেহের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে তার জীবন গড়ে উঠেছিল, তথাপি তার কোথায় যেন একটা ক্ষোভ থেকে যায়। সে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সমাজ শাপের নিশ্বাসে তার জীবন বিষাক্ত। মাতৃসমা বৌদির জ্বর সারে না দেখে রাম অপদার্থ দুর্নীতিপরায়ণ ডাক্তারকে শুনিয়ে দেয় —"আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনের কলমের আমবাগান করেচ, বেশী বড় হয় না তো, ও কুড়ুলির এক এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে এই শিশি-বোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাব।" আবার, শ্যামলাল যখন বিষয়-আশয় ভাগ করে ওকে আলাদা করে দেবার প্রস্তাব করলে, — নারায়ণী বলে—"ও দুধের ছেলে, বিষয়-আশয় নিয়ে কি করবে শুনি?" এতো পরস্পরের আবেগ-অনুভূতির প্রস্রবণ। এর তুলনা কোথা? শরৎচন্দ্র স্নেহের জগতে যে ব্যঞ্জনার প্রবর্তন করেছেন, প্রেমের জগতে তা তিনি করতে পারেন নি। সাপুড়ে যেমন মন্ত্রবলে বিষধর সাপকে বশ করে, ঠিক তেমনি করেই স্নেহমন্ত্রে দুর্দান্ত

কিশোরটিকে নারায়ণী বশ করতো ; অথচ এই বালকটিকে গ্রামের লোকেরা কেন যে ভয় করতো, তার কারণ আছে। সে গ্রামের কারো অন্যায় কাজ বরদাস্ত করতো না, যা তার স্বাভাবিক ধর্ম। শরৎচন্দ্র নির্ভুলভাবে রামলালের অন্তরটিকে সহমর্মিতার দ্বারা অঙ্কন করেছেন।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাস শ্রীকান্তের চরিত্রে একটি শিশুর ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়। কিন্তু এই মন্দ ছেলেটি সারা জীবন অনাদরে অবহেলায়, আঘাতে আঘাতে ঠোক্কর খেয়ে কোথায় যে হারিয়ে যায়, কেউ তা জানে না। গ্রাম-বাংলার ছেলে শ্রীকান্ত। শহরের আত্মীয়দের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো করে। একদিন স্কুলের মাঠে ফুটবল ম্যাচে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে ইন্দ্র-নাথের সঙ্গে পরিচিত হয়। ইন্দ্রনাথ তার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। ইন্দ্র-নাথের শক্তি সাহস ও মহানুভবতা কিশোর শ্রীকান্তকে মুগ্ধ করে। পণ্ডিত মহাশয়ের মাথার টিকি কেটে দেবার তুচ্ছ অপরাধে তাকে ইস্কুল ছাড়তে হয়। সুস্থমনের 'একটা গোটা মানুষ' কিশোর ইন্দ্রনাথ। যে দেহমনে রুগ্ন কিশোর মেজদাকে 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার' থেকে রক্ষা করে, সে সত্যিই বিপদভঞ্জন। লোকে বলে- লক্ষ্মীছাড়া, ডানপিটে, বেপরোয়া। কিন্তু সে তাজা কিশোর প্রাণের বিজয়কেতন। একদিন গভীর অন্ধকারে ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত নিয়ে ডিঙিতে চেপে মাছ চুরি করতে যায় গহন বনের মধ্য দিয়ে—, যেখানে ভূতের ভয় ; শুয়োর ও সাপের উৎপাত। হঠাৎ ইন্দ্রনাথ ছয়-সাত বছরের ছেলের মৃতদেহ ডিঙিতে তুলে নেয় সামনে চড়ার ঝাউ বনে তাকে রেখে আসবে বলে। শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করে,—"কি জাতের মড়া, তুমি ছোঁবে ?" ইন্দ্রনাথ বলে—"মড়ার কি জাত থাকে রে" ? এই দুই কিশোরের তর্কের মধ্যে দুটি ভিন্ন সত্তা প্রকাশ পেয়েছে। একজন বিজ্ঞ লোকের মতো সমাজমনস্ক, আরেকজন মহাপ্রাণ, বিশ্বাসে জ্বলন্ত। আবার মেজদা, ছোটদা, যতীনদার মতো বীরপুরুষ, যারা হুম শব্দে মূর্চ্ছা যায়, তাদেরও চরিত্র চিত্রণে তিনি সুনিপুণ শিল্পী। বিশেষত, মেজদার মধ্যে একটি পাকা বৃদ্ধ ব্যক্তি বসে আছে, যার কথাবার্তায় ও কর্ত্তব্যে বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যা সত্যিই হাস্যকর। শ্রীকান্তের মেজদা

ও নতুনদা যেন দুজনেই হাসির ফ্রেমে-আঁটা চিত্র। এরা কৌতুক রসের উৎস স্বরূপ। পাঠক এদের দুজনকে ভুলতে পারে না।

শিশুর বিশ্বাসে আঘাত লাগলে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। বিশ্বাস এমন বস্তু। ইন্দ্রনাথ অন্নদাদিদিকে শ্রদ্ধা করে। অথচ অন্নদাদিদির কাছে যখন শুনলো সাপের মন্ত্র, কড়ি চালা, মড়া বাঁচানো সবই ধাপ্পা, তখন সে ক্ষেপে লাল। ইন্দ্রনাথের অন্ধ বিশ্বাসের উপর আঘাত পড়ায় সে অন্নদাদিদিকে ঠগ-জোচ্চর বলে গালাগালি দিতেও কসুর করল না। যে নির্ভেজাল বিশ্বাসে এতদিন অন্নদাদিদির জন্য সে জীবন দিতে প্রস্তুত, যে বিশ্বাসে সে জবাফুল দিয়ে মা কালীকে ডাকে শ্রীকান্তের বিপদ না হয় তার জন্যে, সেই বিশ্বাসের মূলে চিড় ধরিয়ে দিয়েছিল—অন্নদাদিদি। কিন্তু ইন্দ্রনাথের মনটি ঐ জবাফুলেরই মত নরম ও রক্তিম। যখন শাহজী অন্নদাদিদিকে মার ধোর করলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন সে ক্ষিপ্ত, সে শাহজীকে প্রায় মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। আবার যখন ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত অন্নদাদিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফেরার জন্য নৌকায় এসে বসল, সে দৃশ্য কোন দিন ভুলবার নয় —"দুজন নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।" ইন্দ্রনাথের আহত অভিমান বুকের দরিয়ায় উথলে উঠেছে।

আবার, সে দস্তিজপাড়ার কৈশোর উত্তীর্ণ নতুনদাকে ক্ষমা করেছে, তার বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়েছে নতুনদাকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। পরিবেশের গুণেই হোক, কিংবা বংশগত ব্যাপারেই হোক— যৌবনাগমে কিশোরদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যদি যথাযথ কাজে লাগানো না যায়, তাহলে তারা বিপদগামী হয়ে ওঠে। নতুনদা তারই দৃষ্টান্ত মাত্র। অন্তঃসার-শূন্য আস্ফালনই যার সম্বল, কর্মের ঢেড়স। কিন্তু ইন্দ্রনাথ? যার জীবনে কর্মের বিকল্প বলে কিছু নেই। উৎসাহী, প্রাণবন্ত তরুণ সমাজের প্রতিনিধি।

'দত্তা' উপন্যাসের পরেশকে আমরা ভুলিনি। পরেশ যেন একটি

শিশুদূত ঃ নরেন-বিজয়ার মিলনে পরেশের ভূমিকা মানব-দূতের মতই। একটি শিশু যে কতখানি বিশ্বাসের পাত্র হতে পারে তারই প্রাণবন্ত নিদর্শন পরেশ। মানবতার অগ্রদূত শিশু ঃ আবার শিশুর কাছ থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশী সেবা ও কাজ পেতে পারে। পরেশ নরেনের সংবাদ আনে সামান্য বাতাসার জন্য। বাতাসা পরেশের কাছে অসামান্য, যেমন নরেন অসামান্য বিজয়ার কাছে। একটা লাটাই-এর লোভে পরেশ আবার নরেনকে বিজয়ার কাছে ধরে আনে। তার যেমন লাটাই এর প্রতি দারুণ আকর্ষণ, টুপি-পরা বাবুর প্রতি বিজয়ার আকর্ষণ তার চেয়ে কম নয়, এই শিশুটি তা বোঝে। পরেশ সামান্য শিশু—কিন্তু উপন্যাসে পরেশের ভূমিকাটুকু অসামান্য, যার অবদান সামগ্রিক ভাবে যথেষ্ট।

'বৈকুন্ঠের উইল' এর গোকুল চরিত্রটি মানবিক দিক থেকে একটি সুন্দর নমুনা। গোকুল সৎ কিন্তু লেখাপড়ায় ভাল নয়। মাতৃহারা হয়ে সৎমাকেই মা বলে জানে। মাতৃভক্তি ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রতি তার স্নেহের টান দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যৌথ পরিবারকে রক্ষা করবার জন্য এমন আত্মভোলা কিশোরদের অবদান নিশ্চয় অভিনব।

বিন্দুর ছেলে অমূল্য। অমূল্য বিন্দুর আসল ছেলে নয়, সে বড়মা অন্নপূর্ণার ছেলে। বিন্দুর ফিটের ব্যামো ছিল—সেই ফিটের ব্যামো সারানোর জন্যই শিশু অমূল্যের সান্নিধ্য টনিকের মতো কাজ করেছিল। বন্ধ্যানারীর যত কিছু সাধ-আহ্লাদ এই শিশুটিকে নিয়ে।

'নিষ্কৃতি'র অতুল একটি typical শিশু চরিত্র। যেমনি ফ্যাশন-দোরস্ত তেমনি অবাধ্য, মা-বাপের আদরের ধন। আবার মনীন্দ্র ঠিক অতুলের বিপরীত। কাকীমা শৈলজার প্রতি অতুলের অশালীন আচরণে সে ক্ষুব্ধ।

'রামলার ফল' বাৎসল্য রসের গল্প। গয়ারামের যত কিছু আব্দার তার জ্যাঠাইমা গঙ্গামণির কাছে, যেমন রামলালের ছিল বৌদি নারায়ণীর প্রতি। গোঁয়ার-গোবিন্দ গয়ারামের যত কিছু আব্দার-উৎপাত সহ্য করে গঙ্গামণি বাৎসল্যের টানে। মাতৃস্নেহ এমনই জিনিষ।

আমিনা গরীব চাষী গফুর জোলার দশ বছরের মেয়ে। অন্ধ ধর্মাশ্রিত ঘুণধরা সমাজের বলি দশ বছরের মেয়েটি, তাকেও বাবার সঙ্গে তাদের সাত-পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে শহরে, যেখানে হয়তো ইজ্জত থাকবে না। গল্পটি খুবই ইঙ্গিতধর্মী।

কেষ্ট বা কেষ্টধন 'মেজদিদি' গল্পের একটি কিশোর চরিত্র। স্নেহ-প্রেমের অশ্রুসজল চিত্র। কেষ্টর মা মুড়ি-কড়াই ভেজে অতিকষ্টে কেষ্টকে চৌদ্দবছরের করে মারা যায়। উপায়হীন হয়ে নিজের বৈমাত্রেয় বড়বোন কাদম্বিনীর কাছে আসে, কিন্তু নিজের দিদি তাকে দিয়ে প্রচুর কাজ করিয়ে নিত, কিন্তু খেতে দিত না, অথচ দিদির মেজ-জা হেমাঙ্গিনী তাকে খুব ভালবাসত। কেষ্ট সামান্য কাঙাল ছেলে, তাকে কেন্দ্র করেই বাৎসল্যরসের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়ে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। পুত্রকন্যা, সংসার থাকা সত্ত্বেও মেজদিদির অপরিমেয় স্নেহধারা যেমন গল্পের জটিলতা বৃদ্ধি করেছে, তেমনি করুণরসের সৃষ্টি করেছে।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে নির্যাতিত অন্ত্যজ ঘরের ছেলে কাঙালী চরণের বেদনা ও বঞ্চনার চরিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। হৃদয়হীন সমাজের নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায় হতভাগা কাঙালীচরণ তার মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের মুখে আগুন দিতে পারেনি। একটি পবিত্র নিষ্পাপ ছেলে কোন অপরাধে শুধু সমাজের অবজ্ঞাই পেয়ে গেল।

'পণ্ডিত মশাই' এর কেষ্টা কলেরায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃন্দাবনের ছ'বছরের হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু চরণ বাবা ও ঠাকুমার চোখের-মণি ছিল। কিন্তু এই শিশুটির অকাল মৃত্যুও করুণরসের সৃষ্টি করে। মনে হয় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষাল ও তারিণী মুখুয্যের দল চরণের মত কচি কচি শিশুর মৃতদেহ নিয়ে গেন্ডুয়া খেলছেন।

'চন্দ্রনাথের' বিশ্বেশ্বরও একটি শিশু চরিত্র, চন্দ্রনাথ ও সরযূর শিশু পুত্র। শরৎচন্দ্রের শিশু ভোলানাথ। কিন্তু এই ভোলানাথের সঙ্গী একজন বুড়ো ভোলানাথ—কৈলাসচন্দ্র। দাবা খেলার সঙ্গী। লাল রঙের 'মন্ত্রী'টি ছিল শিশুর একান্ত প্রিয়। কিন্তু যেদিন সরযূ শিশু সন্তানটিকে

নিয়ে স্বামীর ঘরে চলে গেল, সেদিন থেকে কৈলাসচন্দ্রের বুক ভেঙে খান খান হয়ে গেল। বেশীদিন তিনি বাঁচলেন না। মৃত্যুর সময় বিকারের ঘোরে ঐ নাতিটির কথাই বলেছেন ঃ "বিশুদাদা, আমার মন্ত্রীটা ?"

'লালু' গল্পে লালু একটি ডানপিটে ছেলে। ইন্দ্রনাথের মত তার সাহস। তার কাছে—"বাড়িতে মাষ্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।" তাই মায়ের উপর রাগ করে তার মায়ের গুরুদেবকে জব্দ করে, মশারির উপর খানিকটা বরফ রেখে দিয়ে। গায়ের উপর টপ্ টপ্ করে জল পড়ায় গুরুদেব ভেবেছিলেন ছাদটা হয়তো ফাটা। ফলে সারারাত না ঘুমিয়ে কাটায়।

শরৎচন্দ্র কৌতুক রসসৃষ্টিতে অদ্বিতীয় পারঙ্গম শিল্পী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের শিশুচরিত্রগুলি নানা সম্ভারে পরিপূর্ণ। সমাজের জটিল কুটিল আবর্তে তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ সাধন ঘটেনি। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে যেমন ঠিকমত অঙ্কুরোদ্গম ঘটে না, সমাজ শাপের নিশ্বাসে শরৎ-শিশুরা পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারে নি। যাই হোক, শরৎচন্দ্রের শিশু বা কিশোরেরা পল্লীসমাজের পাপচক্রে পড়ে ভারাক্রান্ত। শরৎচন্দ্র হয়তো সবদিক থেকে শৈশবে বঞ্চিত ছিলেন—প্রেয় বা শ্রেয় কিছুই পাননি ; তাই – তাঁর চোখে দেখা শিশুদের মধ্যে বিস্ময়-বোধ, অশেষ কৌতূহল, অসীম জিজ্ঞাসা – যা শিশুমনের ধন, তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর শিশুরা উপায়হীন, কারো মা নেই, কারো বাবা নেই, একটু সামান্য স্নেহের পরশে তারা বেঁচে উঠতে পারে, এমন স্পর্শ নেই। বাস্তব পটভূমির উপর ভিত্তি করেই তাঁর চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে, কিন্তু তাদের বুকের গুরুতর বেদনার কথা প্রকাশ পেল না। শিশু-দের ইচ্ছা বড়োদের ইচ্ছার সমান নয় ; ছেলেরা জানে আনন্দকে, শিশু আনন্দময় সত্তার অংশবিশেষ, অথচ মানবতার অগ্রদূত। বিভূতিভূষণের ভাষায় বলা যায়—"ছোট্ট ছোট্ট জ্বলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে আনন্দভরা হাসিমুখে অন্ধকার কুঞ্জবনের এদিকে-ওদিকে বেরিয়ে কোথায় সব চলে গেল। ... . অপর কোন অরণ্যানীর গহন নীরব পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করতে।" শরৎচন্দ্রের সেই শিশুরা কোথায় !

বৈকুণ্ঠের উইল ঃ পারিবারিক জীবনের দলিল

"স্নেহ সুধামাখা বাস গৃহতল আরো আপনার হবে"—কবি রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রের পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে তারই সুর ধ্বনিত হয়। 'মেজদিদি', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি' ও 'বৈকুন্ঠের উইল' প্রভৃতি গল্পে একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের বিরোধ, জটিলতার মধ্য দিয়েই স্নেহ-মমতা-করুণার জাহ্নবীধারা প্রবাহিত হয়েছে। সেই জাহ্নবীধারার পবিত্র জল পান করে পাঠক পরিতৃপ্ত ও খুশি। একান্নবর্তী সংসার কেমনভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তারই চিত্র অংকন করেছেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। বাহিরের অবাঞ্ছিত লোকের আবির্ভাবে সোনার সংসারে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তারই বাস্তবচিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে। আরো লক্ষণীয় যে, অবুঝ মেয়েরাই সংসারে অশান্তি ও বিশৃংখলা আনে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা পারিবারিক জীবনে যতই বিরোধ, সংকট, অপ্রীতিকর ঘটনা আসুক না কেন, তিনি স্নেহ-প্রীতি ও মিলনের জোরে সংসারের শান্তিকে বজায় রাখতে চেয়েছেন। বাস্তবিক—"শরৎচন্দ্র প্রেমমূলক গল্প-উপন্যাসে গভীর দুঃখবাদী। কিন্তু '।।রিবারিক আদর্শভিত্তিক রচনাগুলিতে আশ্চর্য রকমের আশাবাদী।" *

'বৈকুন্ঠের উইল' একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের দলিল,—যে পারিবারিক জীবনের ধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। তারই চিত্রণ অংকন করেছেন। একটি উদার আত্মভোলা কিশোরের সততা, নিষ্ঠা, ভালবাসা, মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃ প্রেমের পরাকাষ্ঠা এই গল্পটির বিষয়বস্তু। এই কিশোরটির নাম—গোকুল ঃ সরল কিন্তু লোকে বলে নির্বোধ মানুষ —বিষয়সম্পত্তি ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারে না।

---

* শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার ঃ ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।

বিষয় সম্পত্তি অনর্থের মূল এবং পারিবারিক জীবনকে বিভ্রান্ত করে তোলে—তা শরৎচন্দ্র বুঝতেন ! তাই তার বাবা গোকুলের মতো গোবেচারা ছেলের নামে বিষয় সম্পত্তি উইল করে দেওয়ায় সে খুবই বিব্রত বোধ করে। তাছাড়া গোকুল সত্যিই তার সৎমার ছেলে বিনোদকে ভালোবাসে ; বিনোদ যে গোল্ডমেডেল পাওয়া 'অনার গ্র্যাজুয়েট'। মূর্খ গোকুল এমন সোনার টুকরো ভাইকে ভালো না বেসে পারে না। অথচ বিনোদের স্বভাব-চরিত্র খারাপ হওয়ার জন্য বিনোদের মায়েরই সম্মতি নিয়ে বৈকুন্ঠ বিনোদকে ত্যজ্যপুত্র কোরে গোকুলের নামে সম্পত্তি উইল করে দেন। গোকুল তা চায় না। গোকুলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এখানেই। শরৎচন্দ্র এই নাতিদীর্ঘ গল্প-টিতে পারিবারিক জীবনের শান্তিময় নীড়ের ছবি এঁকেছেন। বিমাতার সঙ্গে সপত্নী পুত্রের আচরণ, কর্ত্তব্য, অটল ভক্তি, আবার সৎ সন্তানের প্রতি বিমাতার স্নেহ-মমতার দৃষ্টান্ত দেখে আমরা মুগ্ধ। হিংসা নয়, বিরোধ নয়,—একমাত্র সুগভীর মমত্বই পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করে রাখে। শরৎচন্দ্র যে একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র অঙ্কন করেছেন তা হল পল্লীবাংলার প্রাক-আধুনিক সমাজ-চেতনার এক উজ্জ্বল ছবি। এই প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়-এর মন্তব্য উল্লেখ্য ঃ "অতি-আধুনিক যুগের দুই-একজন অসাধারণ ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বোধহয় শরৎচন্দ্রই শেষ লেখক যাঁহার রচনায় যৌথ পরিবাবের চিত্র অঙ্কিত ও সমাজনীতির শাশ্বত মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে।" (সমাজ সাহিত্যের পারস্পারিক সম্পর্ক ঃ 'সাহিত্য-সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে')

গোকুল যৌথ পরিবার-জাত যুবক, আবার ভারতীয় শাশ্বত পুরুষের একজন। আত্মভোলা মানুষ। ছলনা, চাতুরী জানে না। খুবই বোকা। কোন বিদ্যাই নেই। ক্লাসের পরীক্ষায় বারংবার ফেল করে, নকল করবার মতনও তার বিদ্যা নেই, যা অনেকেরই থাকে। নিজের স্বার্থ-সম্পর্কেও সচেতন নয় অথচ সংসারের নিয়মই হল স্বার্থ। তবে তার একটা অহং আছে, যে অহংজ্ঞান হল মানুষের জীবনের গোড়ার কথা। আবার এই অহংজ্ঞানই হল মানুষের সবচেয়ে মধুর দুর্ব্বলতা—যে দুর্ব্বলতায় অন্ধ

হয়ে গোকুল বৈমাত্রেয় ভাই, বিনোদের জন্য গর্ব্বিত। সে জানে বিনোদ ডবল প্রমোশন পেয়েছে। তার গর্ব্ব ও আনন্দের সীমা নেই। বিনোদের মা ভবানী তার সৎমা, কিন্তু সে জানে—ভবানী তারই মা। এও একপ্রকার অহংকার।

সমাজজীবনে যেমন কুচক্রী মানুষের অভাব হয় না, আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকে, কারো ঘাড় ভাঙবার জন্যে, তেমনি গ্রাম্য জীবনেও কুচুটে অবাঞ্ছিত মানুষের অভাব হয় না সংসারের শান্তি তছনছ করতে। 'বৈকুণ্ঠের উইল' গল্পে শিক্ষক জয়লাল বাঁড়ুয্যে ও গোকুলের শ্বশুর নিমাই রায় মূর্তিমান শনি। অবশ্য এই সোনার-পরিবার ভেঙে যাবার মূলে গোকুলের স্ত্রী মনোরমা, যেমন 'নিষ্কৃতি' গল্পের নয়নতারা নাগিনীর মতো বিষ নিয়ে সংসারে প্রবেশ করে। বিষের তীব্র জ্বালায় সংসারের শান্তি-শ্রী জ্বলে যায়। মনোরমা গোকুলের কানে কোন বিষমন্ত্র শুনিয়েছিল, যার ফলে বিমাতার প্রতি সে অশ্লীল আচরণ করেছিল। শুধু তাই নয়, ঘরে বড়ো বিষ দেখে মনের কষ্ট বুকে চেপে ভবানী এ-বাড়ী ছেড়ে চলে গেল বিনোদের সঙ্গে। কিন্তু স্নেহ যে বিষম বস্তু! স্নেহই গোকুলের বিবেকের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল। মা-ছাড়া মূর্খ গোকুল সব অন্ধকার দেখে। গোকুল বুঝতে পারে—জয়লাল বাঁড়ুয্যের উস্কানি ও প্ররোচনা; কুচক্রী শ্বশুর নিমাই রায়ের কারসাজি, ভণ্ডামী ও চাতুর্য—যে ধুরন্ধর নিমাই রায় একদা নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কাণা করে জামাইয়ের সংসারের হাল ধরতে আসে এবং গোকুলের স্নেহসুধামাখা সোনার-সংসাব রসাতলে ডুবিয়ে দেয়। অথচ সব জেনেও এইসব পাষণ্ডদের কেন যে মানুষ প্রশ্রয় দেয়, তা আমরা বুঝতে পারি না। হয়তো জীবনের নিয়মই তাই। কিংবা অদৃষ্টের পরিহাস! যাই হোক, বিমাতার সঙ্গে সপত্নী পুত্র গোকুলের সম্পর্ক স্বর্গীয়, মহান, পবিত্র, সুন্দর ও শাশ্বত। তাই মা-ভবানী বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর গোকুল প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠে; সুপ্ত মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রেম তাকে উথলা কোরে তোলে। সে ছুটে চলে যায় বিনোদের বাড়ী, মা ও বৈমাত্রেয় ভাই বিনোদকে শুনিয়ে বলে—"সব মিথ্যে। কলিকাল—আর কি ধর্মকর্ম

আছে ? বাবা মরবার সময় মাকে আমায় দিয়ে বল্লেন, "বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা"। গোকুলের এই সহজ-সরল বিশ্বাস অস্বীকার করা যাবে না, মা ভবানী তাকে নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন। আবার একটি নির্বোধ অথচ সরল মানুষের মুখ দেখতে পাবো—তার কথায় ও আচরণে ; সে বলে—"আমি ভাল মানুষ, নইলে বেন্দার বাপের সাধ্য কি সে আমার মাকে জোর করে নিয়ে আসে। কেন আমি ছেলে নই ? ইচ্ছে করি যদি এখন জোর করে নিয়ে যেতে পারি। এই হল বাবার আসল উইল।" এ মান-অভিমান ও ক্ষোভের মধ্যে গোকুলের আসল চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গোঁয়ার-গোবিন্দ অবুঝ মূর্খ মানুষের অন্তরতম সত্তার স্ফূর্তি জাগরিত হয়েছে। সাধারণত বাঙালী সংসারে বৈমাত্রেয়—ভাই ভাইকে হিংসায় ও বিদ্বেষে সহ্য করতে পারে না ; কিন্তু গোকুল বিমাতাকে পাবার জন্য নিজের সম্পত্তি বিনোদকে দিয়ে দেয় উইলের নির্দেশ না মেনে। স্নেহ-মমতার এরূপ বাস্তবচিত্র কদাচিৎ চোখে পড়ে।

আবার গোকুলের শুভবোধের উদয়ে কুচক্রী শনি নিমাই রায় গোকুলের বাড়ী ছেড়ে পলায়ন করে। ভাই বিনোদের চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের এই আশাবাদ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। 'বৈকুন্ঠের উইল' গল্পে শরৎচন্দ্র উপদেশ দিতে বসেননি, আমাদের বিবেকের প্রতি ইঙ্গিত রেখে গেছেন। সংস্কারগত নীতিবোধ ছাড়া আর একটি গভীরতর, মহত্তর নীতি আছে. সে নীতি-দেশ কাল জাতি ধর্মের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যায়, যা চিরন্তন মানবতাবোধ। গোকুলের চরিত্রে সেই চিরন্তন মানবতাবোধের লক্ষণ চিহ্নিত। প্রতিদিনের হাসি কান্না, মান-অভিমান, টুকরো টুকরো ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাতের পিছনে কতো ভালোবাসার, কত দুঃখের ইতিহাস নিহিত আছে, তা স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে এড়ায় নি। মধ্যবিত্ত বাঙালীর পারিবারিক জীবনের বাৎসল্যরসের চিত্র তাঁর রচনায় যেমন সজীব ও হৃদয়স্পর্শী, তেমনি খুব কম লেখকের রচনায় তা খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র মূলত কথাশিল্পী। জীবন যজ্ঞশালায় সুন্দর কুৎসিতের যে পূর্ণাহুতির লীলাখেলা চলছে, তিনি তারই দ্রষ্টা। তিনি লোকচিত্তজয়ী গল্প-কথাকার। তাঁর হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্য তাঁর বুদ্ধি ও মননকে গ্রাস করেছিল। "এ দেশের পচা জলহাওয়ার দোষ" তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যকে সংক্রামিত করেছিল। ব্যক্তিজীবনে হৃদয়াবেগের দাপট তাঁর যুক্তি, মনন ও বক্তব্যকে দাবিয়ে রেখেছিল। ফলে, শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যও একই আবেগে সাঁৎসেতে হয়ে উঠেছিল। প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্র স্ববিরোধে দ্বিধাবিভক্ত কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর মতো একজন প্রবক্তা।

বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রাচুর্য ব্যাপক ছিল না। তাঁর প্রবন্ধের পরিমাণ স্বল্প। জীবনের কোন অনুভূত সত্যকে রূপদানের জন্যই তিনি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি অপেক্ষা সূক্ষ্ম রসবোধই শরৎচন্দ্রের সমালোচনাকে রসোজ্জ্বল করেছে। তাঁর ৪টি মাত্র প্রবন্ধ পুস্তক,— 'নারীর মূল্য' (১৯-২৪), 'তরুণের বিদ্রোহ' (১৯২৯), 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (১৯৩২), শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ' (১৯৩৯) এবং কিছু সাহিত্য বিষয়ক অভিভাষণ ও পত্রাবলী এর মধ্য দিয়েই প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তাকে খুঁজে নিতে হবে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে হয়তো বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ নেই, কিন্তু আলোকিত হয়েছে—শিক্ষা, সাহিত্য সমাজ ও রাজনীতি। প্রবন্ধের বক্তব্য সুস্পষ্ট, style অনবদ্য, চিন্তার মৌলিকতা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁর অবদান পরিমাণের দিক থেকে স্বল্প কিন্তু গুণগত সৌকর্যে অসামান্য।

'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ পুস্তকখানিতে শরৎচন্দ্র নারী সমস্যার বিষয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন। গল্প সাহিত্যের চেয়েও তিনি এই ১৩৩ পাতায় বইখানি খুবই স্থির চিত্তে ও দরদ দিয়ে লিখেছিলেন। নারী যুগ যুগ ধরে সমাজ কর্তৃক শোষিত, পুরুষের দ্বারা নিগৃহীত। কিন্তু

সভ্যতার আদি পর্বে নারীর এরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। কিন্তু সমাজের মাতৃতান্ত্রিক যুগে নারীর সুযোগ ও অধিকার সুরক্ষিত ছিল। আবার, পিতৃতান্ত্রিক যুগে নারী পুরুষের ভোগের নৈবেদ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। সেবা ও ভোগের দাসীরূপে নারী চিহ্নিত হয়। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর বলি হয়ে নারীও তার সমস্ত ইজ্জত হারিয়েছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি কুলত্যাগিনীর করুণ চিত্র উপস্থাপিত করেছেন— "বারো-তেরো বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাংলাদেশের কুলত্যাগিনী বহু রমনীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলায় বহু সহস্র হত-ভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবন্ধ ছিল। ······আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়া-ছিলাম যে, এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তর জন সধবা। বাকি ত্রিশটি মাত্র বিধবা। ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অত্যাধিক দারিদ্র্য ও স্বামী প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন। সধবাদিগের প্রায় সব-গুলিই নীচজাতীয়া, আর বিধবাগুলির প্রায় সবগুলিই উচ্চজাতীয়া।" এই উদ্ধৃতির মধ্যেই প্রমাণিত হয় যে তিনি নারী চরিত্রের পরিণাম সমাজ-তাত্ত্বিক তথ্য ভিত্তির উপর নির্ভর করে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করে-ছেন। সমাজ বিবর্তনের আলোকে নারীর যথার্থ মূল্যায়ণ করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজের নারীর বঞ্চনার কথাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন—"একযুগে নারী ছিল গৃহপালিত পশুর সমান, এবং নীচ"। নারী নাকি পুরুষের মালিকানা সম্পত্তি। "পুরুষ বুঝাইয়াছে সহমৃতা হওয়া সতীর পরম ধর্ম। মনুও বলিয়াছেন, এক পতি-সেবা ব্যতীত স্ত্রীলোকের আর কোন কাজ নাই। সে ইহকালে পুরুষের সেবা করিয়াছে। পরকালে গিয়াও করিবে।" উপরিউক্ত মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্রের যেমন নারী সমাজের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা, রীতি-নীতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন মৃদু-ভাষণে। নারীর সহমরণ, বৈধব্য ও অধঃপতন প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন দিক-গুলিও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সতর্কতার সঙ্গে। মনে হয়, তিনি প্রচুর

পড়াশুনো করে তাঁর প্রবন্ধের form তৈরী করতেন ও নিজের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ সম্পর্কে যেমন সুখ্যাতি হয়েছে, তেমন বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। নাট্যকার ডি, এল, রায় বলেছিলেন—"নারীর মূল্য অমূল্য। তোমরা এ লেখককে হাত করবার চেষ্টা করো।" সৌরীন্দ্র মোহনকে লেখা একটি চিঠিতে বিভূতি ভূষণ ভট্ট লিখেছিলেন—"শরৎদার নারীর মূল্য জ্বালাতন করিয়াছে!" আর শরৎচন্দ্র নিজেই প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন—"যাহা সত্য তাহাই বলিব এবং বলিয়াছি অবশ্য ফলাফলের বিচার ভার পাঠকের উপর।"

সামান্য পাঠক হিসাবে বলা যায়—শরৎচন্দ্র সত্যভাষণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর যুক্তি ক্ষুরধার, বিচার-বিশ্লেষণ নিখুঁত ; তথ্য অকাট্য, বক্তব্য সুস্পষ্ট। তাঁর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে নিষ্ঠা আছে, আছে সত্যের উন্মোচন, আছে সততার নিদর্শন। এ যেন বিশ্বের নারী জীবনের দলিল। তথাপি যখনই বিশ্বের নারী সমাজের ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন, তখনই তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বরং ভারতীয় নারীজাতি সম্পর্কিত আলোচনার অংশটি সুচিন্তিত ও বুদ্ধিদীপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্র তারুণ্যকে অস্বীকার করেন নি। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধটি তারই প্রমাণ। রংপুরে অনুষ্ঠিত যুব সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ এটি। এই প্রবন্ধে তিনি যেমন কংগ্রেসের আপোসকামী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন, অপরদিকে তিনি যুব সমাজের বিপ্লবী চেতনাকে—অভিনন্দন জানিয়েছেন। বন্ধন অসহিষ্ণু তারুণ্যের বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ তিনি লক্ষ্য করেছেন। যুবসমাজই জাতির ভবিষ্যৎ, আশা-ভরসা ; রক্ষা কবচ। যৌবনশক্তি ছাড়া স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। ইতিহাসে দেখা যায়—যুব-শক্তিই দেশে দেশে কালে কালে মাতৃভূমিকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করেছে। আগাগোড়া এই প্রবন্ধটি যৌবনধর্মের জয়গানে মুখরিত। তিনি বলেন—"স্বাধীনতা শুধু 'কেবল একটা নামমাত্রই ত নয়। দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই ত একে

ভিক্ষার মত পাওয়া যায় না — এর মূল্য দিতে হয়। কিন্তু কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত।" শরৎচন্দ্রের হৃদয়াবেগ কুয়াশা ভেদ করে সত্যের উজ্জ্বল বিভায় আলোকিত। ভাষা সংযত, অনুভব বিশুদ্ধ এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত। "ক্ষমাহীন সমাজ, প্রতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা-এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।"

'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধ পুস্তকের পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণে 'তরুণের বিদ্রোহ' ছাড়া 'সত্য ও মিথ্যা' নামে একটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়। প্রবন্ধটি 'বাঙ্গালার কথা'য় ১৩২৮ সালের ২০শে মাঘ ও ৫ই ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির বক্তব্য অর্থবহ ও ইঙ্গিতধর্মী,—সত্যিই পরাধীন দেশে সত্য বললে বিপদ ঘটে। তিনি বলেন—"আজ এই দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার জো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা সিডিশন।" তাছাড়া, সত্যের মুখ বন্ধ করবার জন্য নাট্যকারদের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি ফেলে-দিলেন রাজসরকার,—তাই তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন ঋজু অথচ বলিষ্ঠ ভাষায়।

'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রবন্ধ পুস্তকে মোট সতেরটি প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। স্বদেশ সম্পর্কিত পাঁচটি, সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বারোটি। স্বদেশ বিভাগে—(১) আমার কথা, (২) স্বরাজ সাধনায় নারী, (৩) শিক্ষার বিরোধ, (৪) স্মৃতি কথা, (৫) অভিনন্দন সন্নিবিষ্ট হয়েছে; আর 'সাহিত্য' বিভাগে— (১) ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য, (২) গুরু-শিষ্য সংবাদ (৩) সাহিত্য ও নীতি (৪) সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি (৫) ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত, (৬) আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ, (৭) সাহিত্যের রীতি ও নীতি, (৮) অভিভাষণ (৫৩ম বাৎসরিক জন্মদিন), (৯) অভিভাষণ (৫৫তম প্রেসিডেন্সি কলেজ ভাষণ), (১০) যতীন্দ্র-সংবর্ধনা, (১১) শেষ প্রশ্ন, (১২) রবীন্দ্রনাথ।

তবে, এই সমস্ত রচনার মধ্যে 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি'

'সাহিত্য ও নীতি' 'আধুনিক "সাহিত্যের কৈফিয়ৎ', "সাহিত্যের, রীতি ও নীতি" প্রভৃতি বহুল পরিচিত ও আলোচিত। তাছাড়া, 'সত্যাশ্রয়ী' অভিভাষণে সাহিত্য বিষয়ক ভাবনা-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'সমাজধর্মের মূল্য' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ্য যা সমাজচিন্তার পাকা ফসল। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে তিনি লেখেন,— "বাস্তবিক, ভায়া. এই Sociology লইয়াই বহুদিন কাটাইয়াছি—অনেক কথা বলিবার জন্য প্রাণটা যেন আনচান করে। অথচ. কি করিয়া যে এ সকল, বেশ ভদ্রলোকের মত বলা যায় তাও ঠিক করিতে পারি না।"

তথাপি সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাগুলি সুচিন্তিত ও নিষ্ঠাপূর্ণ। সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রীতিবোধ ছিল অসাধারণ, বক্তব্য ছিল অসাধারণ প্রাণময়। শরৎচন্দ্র কেবলমাত্র রসচর্চার জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, দেশ ও মানুষের কিছু মঙ্গলসাধনে তাঁর সাহিত্যবোধ পরিচালিত হয়েছে। সাহিত্যসেবীদের ব্রত কি হওয়া উচিত, তার একটি স্পষ্ট সূত্র রাখতে চেয়েছেন। সমাজ সচেতনার ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সনাতনবাদী। তিনি মনে করেন— "যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা art নয়, ধর্ম নয়। Art for art's sake কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারে না, এবং অকল্যাণকর ও immoral হলে art for art's sake কথাটাও কিছুতে সত্য নয়, শত সহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে বললেও নয়।" (সাহিত্য ও নীতি)। সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা কত মহৎ ছিল, উপরের উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ।

'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধটিও একটি ভাষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা (১২৩১, ১০ই আশ্বিন)। এই ভাষণে, তিনি বঙ্কিম সাহিত্য সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করেন। তাঁর উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। সাহিত্যে সুনীতি-দুর্নীতি স্থান নির্ণয় করেন। 'পল্লী সমাজ' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সাহিত্যের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য হল—সাহিত্যে সুনীতি ও দুর্নীতি দুই-ই আছে এবং থাকবে। শরৎচন্দ্র 'Art for art's sake,'-এ বিশ্বাসী ছিলেন না। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বলেছেন —"আর্ট-এর জন্যই আর্ট, একথা আমি পূর্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনি। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।" তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন—"Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোংরা জিনিষই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষক ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্রসৃষ্টি কি এতই সহজ?" বাস্তবিক, জীবনের ঘটনা ও সাহিত্যের ঘটনা এক জিনিষ নয়। পরিশীলন ও পরিমার্জনার মধ্যেই যেমন শিল্পের উৎকর্ষতা, অনুরূপ জীবনের ঘটনাবলীর মধ্য থেকে গ্রহণ ও বর্জনের সমীকরণই সাহিত্যের ধর্ম। 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,—"আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না। ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি।"

আবার 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধে বঙ্কিম সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের আদর্শগত পার্থক্য কোথায় তিনি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—"ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সে-ও বলে। কিন্তু ভুলাইয়া নীতি-শিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়তো এই একটা চেষ্টা ধরা পড়বে যে, মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।" সবদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধে সাহিত্য-ভাবনা, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, সুস্থবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, ভাষায় তাঁর অহেতুক উচ্ছ্বাস নেই, বরং বক্তব্য সংযত সংকেতে অর্থবহ।

।। পরিশিষ্ট ।।

জীবনী ও ঘটনাপঞ্জী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬—১৯৩৮)

১৮৭৬, সেপ্টেম্বর ১৫, (৩১শে ভাদ্র ১২৮৩) জন্ম।

জন্মস্থান ঃ হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম। প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্যতম। ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম ভারতের অন্যতম প্রধান শহর ও একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল।

জন্মপরিচয় ঃ পিতা ঃ—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা – ভুবনমোহিনী দেবী। পিতা মতিলালের পৈতৃক বাসভূমি কাঁচরাপাড়ার নিকটে মামুদপুর গ্রাম। মতিলালের পিতা স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করে গৃহত্যাগী হতে বাধ্য হন। অবশেষে বাধ্য হ'য়ে মতিলালের মা ছেলেকে নিয়ে দেবানন্দপুরে চলে আসেন। মতিলাল বাল্যকালে এই মামার বাড়ীতেই মানুষ। মতিলাল আর পিতৃভূমি মামুদপরে ফিরে যান নি।

মতিলাল অল্পবয়সে হালিসহরের রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথের দ্বিতীয় কন্যা ভুবনমোহিনীকে বিয়ে করেন। মতিলালের পাঁচ সন্তান। প্রথম – অনিলাদেবী, দ্বিতীয়—শরৎচন্দ্র, তৃতীয়—প্রভাসচন্দ্র (পরে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন), চতুর্থ—প্রকাশ চন্দ্র, পঞ্চম—সুশীলাদেবী।

দেবানন্দপুর গ্রামের স্মৃতি তাঁর কয়েকটি গল্প-উপন্যাসে প্রতিফলিত।

১৮৮৪-'৮৬ শিক্ষাক্ষেত্র ঃ দেবানন্দপুর ও ভাগলপুর। প্যারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠশালায় হাতেখড়ি। পিতামাতার সঙ্গে গয়া জেলার ডিহরীতে অবস্থান। ভাগলপুরেই লেখাপড়া। তারপর তিনি দেবানন্দপুরে তিন বছর ছিলেন।

১৮৮৬ ভাগলপুরে প্রবাসী বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত দুর্গাচরণ এম. ই স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি।

১৮৮৭ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি।

১৮৮৯ ভাগলপুর থেকে দেবানন্দপুরে প্রত্যাবর্তন ও হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি।

১৮৯৩ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। পুনরায় ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত।

১৮৯৪ টি. এন জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। এই সময় 'শিশু' নামে একখানি হাতে-লেখা পত্রিকার প্রকাশ।

১৮৯৫ টি. এন জুবিলি কলেজে ভর্তি। মা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু। অর্থের অভাবে এফ. এ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। বড়দিদির বাগনানে বিয়ে।

১৮৯৬ পিতা কর্তৃক শরৎচন্দ্রের বসতবাটি বিক্রয়।

১৮৯৬-৯৯ ঃ বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা। ভাগলপুরে অভিনয়, খেলাধুলা, আড্ডা, সাহিত্যচর্চা। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথের (ভাগলপুরের রাজেন মজুমদার) সঙ্গে পরিচয়। সাহিত্যসভা গঠন।

১৯০০ ঃ নিরুদ্দেশ। মজঃফরপুরে হাজির। সঙ্গীত চর্চা। এখানকার জমিদার মহাদেব সাহার সঙ্গে পরিচয় (যিনি 'শ্রীকান্তের' কুমার-সাহেব)।

১৯০২ ঃ হঠাৎ পিতা মতিলালের মৃত্যু। চাকুরীর সন্ধান। মাতুল উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তাঁর দাদা উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে ৩০ টাকা বেতনে হিন্দী পেপার বুকের ইংরেজিতে 'তর্জমা' করার জন্য একটি কাজ দেন।

১৯০৩ ঃ ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশ যাত্রা। 'মন্দির' গল্প লিখে কুন্তলীন পুরস্কার। দক্ষিণা—২৫ টাকা। মেশোমশায় অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের

চেণ্টায় বর্মা রেলওয়ের audit office এ অস্থায়ী চাকরী।

১৯০৫ : অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু। রেলওয়ের চাকরি ছেড়ে বর্মার public works accounts-এ Examiner রূপে চাকরি গ্রহণ। কিছুদিন পরে ঐ চাকরি ছেড়ে বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পেগুযাত্রা। রেঙ্গুন শহর থেকে 'পেগু' ৪০ মাইল দূরে। পেগু-ডিভিশনের executive Engineer-এর অফিসে ৫০ টাকা বেতনে চাকরি গ্রহণ। রেঙ্গুনে কবি নবীনচন্দ্র সেন কর্তৃক শরৎচন্দ্রকে 'রেঙ্গুনরত্ন' বলে ভূষিত। আড়াই মাস পরে বেকার।

১৯০৬ : রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্তন এবং বর্মার public works accounts office এর deputy examiner মনীন্দ্র কুমার মিত্রের সহায়তায় চাকরি পাওয়া। মিস্ত্রির মেয়ে শান্তির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিয়ে।

১৯০৭ : শরৎচন্দ্রের স্বনামে 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'বড়দিদি' প্রকাশ। কোলকাতায় আগমন।

১৯০৮ : শান্তিদেবী ও শিশুপুত্রের প্লেগে মৃত্যু।

১৯১০ : কৃষ্ণদাস অধিকারীর মেয়ে মোক্ষদাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর মোক্ষদার পরিবর্ত্তিত নাম—হিরণ্ময়ী দেবী।

১৯১২ : কোলকাতায় আগমন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। 'যমুনা' পত্রিকার 'বোঝা' গল্প প্রকাশ।

১৯১৩ : 'যমুনা' পত্রিকায় 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে' —গল্প প্রকাশ। এই বছর ৩০শে সেপ্টেম্বর 'বড়দিদি' প্রকাশ করেন যমুনার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল।

১৯১৪ : দ্বিতীয় গ্রন্থ—'বিরাজ বৌ' প্রকাশ। 'বিন্দুর ছেলে'—গল্পগ্রন্থ (৩টি গল্পের সমষ্টি) প্রকাশ। 'যমুনা'র অন্যতম সম্পাদক রূপে শরৎচন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ। 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিত মশাই' প্রকাশ। 'যমুনায়'—'চরিত্রহীন'—প্রকাশ অসমাপ্ত। 'যমুনা' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ।

১৯১৫ : 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মেজদিদি গল্পগ্রন্থের ৩ টি গল্প —'আঁধারে আলো' 'মেজদিদি' ও 'দর্পচূর্ণ' প্রকাশ।

১৯১৬ ঃ পা ফোলা অসুখে আক্রান্ত। ছুটির জন্যে উপরওয়ালা ও সাহেবের সঙ্গে বিবাদ। চাকুরীতে ইস্তফা। এপ্রিলে রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে ফিরে এসে হাওড়ার বাজে শিবপুরে বসবাস। 'পল্লী সমাজে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাস প্রকাশ। 'বৈকুণ্ঠের উইল' গল্প প্রকাশ।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব প্রকাশ। 'দেবদাস' উপন্যাস প্রকাশিত। 'নিষ্কৃতি' উপন্যাস প্রকাশ।

১৯১৭ ঃ 'কাশীনাথ' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ। এতে সাতটি গল্প—১) কাশীনাথ (বামুন ঠাকুর). ২) আলো ও ছায়া, ৩) মন্দির ৪) অনুপমার প্রেম, ৫) বোঝা ৬) হরিচরণ, ৭) বাল্যস্মৃতি।

১৯১৮ ঃ কবিগুরুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ-'বিচিত্রা'র আসরে। 'বিলাসী' গল্পটি পাঠ করেন ঐ আসরে। 'স্বামী গল্পগ্রন্থ প্রকাশ ঃ দুটি গল্প :— ১) স্বামী, ২) একাদশী বৈরাগী। 'দত্তা' উপন্যাস প্রকাশ। 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্ব প্রকাশিত হয়।

১৯১৯ ঃ রূপনারায়ণের তীরে পানিত্রাস গ্রামে জমি ক্রয়।

১৯২০ ঃ 'ছবি' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ। ৩টি গল্পের সমষ্টি—১) ছবি, ২) বিলাসী ৩) মামলার ফল। 'গৃহদাহ' উপন্যাস প্রকাশ। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাস প্রকাশ।

১৯২১ ঃ অসহযোগ আন্দোলন সুরু। দেশবন্ধুর ডাকে কংগ্রেসে যোগদান ও হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণ। 'বারোয়ারী' উপন্যাস প্রকাশ। জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে 'শিক্ষার বিরোধ' নামে ভাষণ পাঠ। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পঠিত প্রবন্ধ – 'স্বরাজ সাধনায় নারী'।

১৯২২ ঃ দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর মানপত্র রচনা। শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) এর ইংরাজী অনুবাদ। অনুবাদক K. C. Sen and Theodosia Thompson.

১৯২৩ ঃ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'জগত্তারিণী' সুবর্ণপদক

প্রদান। দেশবন্ধুর সঙ্গে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান। শিবপুর ইনস্টিটিউটে সভাপতির ভাষণ—'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ'। 'নারীর মূল্য' প্রকাশ। 'দেনা পাওনা'—উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ।

১৯২৪ ঃ 'নববিধান' উপন্যাস প্রকাশ।

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনে দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগদান।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখা কর্তৃক সংবর্ধিত। 'ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য' পাঠ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখায় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিপদে বরণ। 'কৃষ্ণকান্ত উইল'-এর রসগর্ভ আলোচনা।

১৯২৫ ঃ রূপনারায়ণের তীরে পাণিত্রাস গ্রামে গৃহনির্মাণ।

বারাণসী গমন ও 'বিশ্বনাথ লাইব্রেরীর' নবম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ।

মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব গ্রহণ। 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' ভাষণ।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে শরৎচন্দ্রের মন ও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।

১৯২৬ ঃ 'হরিলক্ষ্মী' গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ঃ মোট ৩টি গল্প—(১) হরিলক্ষ্মী (২) মহেশ (৩) অভাগীর স্বর্গ।

৩১শে আগস্ট 'পথের দাবী' উপন্যাস প্রকাশ।

ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত, প্রতিবাদ না করায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি অভিমান, মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যু।

১৯২৭ ঃ 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের প্রকাশ।

'ষোড়শী' নাটক প্রকাশিত—'দেনা পাওনা' নাটকের নাট্যরূপ।

'ষোড়শী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ও চিঠি পত্রের আদান-প্রদান, মান্দালয় জেল থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীদের মুক্তি।

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে বিপ্লবীদের সম্বর্ধনা জানান। শিবপুর সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের পঞ্চাশোত্তীর্ণ জন্মদিন পালন।

ইতালীতে শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব)-এর অনুবাদ প্রকাশ।

র‍্যা রলাঁ কর্তৃক অভিনন্দন জ্ঞাপন।

১৯২৮ : পুরুলিয়া 'হরিপদ সাহিত্য মন্দির' পাঠাগারে বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি। পল্লীসমাজের নাট্যরূপ—'রমা' নাটক প্রকাশিত।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ভাষণ দান।

৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিনে University Institute-এ দেশবাসী কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত আশীর্বাদ বাণী।

১৯২৯ : মালিকান্দা অজয় আশ্রমে পশ্চিম বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মেলনে সভাপতি পদে বরণ। রংপুর যুব সম্মেলনে সভাপতি হন।

হাওড়া জেলার মাজুতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচন। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রকাশ।

১৯৩০ : লাহোর প্রবাসী বাঙালীদের অভিনন্দন।

১৯৩১ : 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস প্রকাশ।

রামমোহন লাইব্রেরীতে রাজা রামমোহন রায়ের অষ্টনবতিতম স্মৃতি সভায় সভাপতি। কুমিল্লায় যুব সম্মেলনে সভাপতি পদে বরণ।

কোলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষ উপলক্ষে মানপত্র রচনা।

১৯৩২ : 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রকাশ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রা' (রথের রশি ও 'কবির দীক্ষা') বইখানি উৎসর্গ করেন শরৎচন্দ্রের ৫৭ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড়মঠ প্রাঙ্গণে বক্তৃতা। সভাপতি ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু।

১৯৩৩ : 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব প্রকাশিত। হাওড়া পারিজাত সমাজ কর্তৃক অভিনন্দিত।

১৯৩৪ ঃ 'অনুরাধা-সতী ও পরেশ' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।
'বিরাজ বৌ' নাট্যাকারে প্রকাশিত ও অভিনীত।
'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিজয়া' নাটক প্রকাশিত ও 'ষ্টারে' অভিনীত। ২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোডের নতুন-গৃহে প্রবেশ।
ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি।

১৯৩৫ ঃ 'বিপ্রদাস' উপন্যাস প্রকাশ।
হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ।
গান্ধীজির সঙ্গে ইংরাজ সরকারের 'পুণা'-চুক্তির বিরোধিতা ও রবীন্দ্রনাথকে অংশগ্রহণে অনুরোধ।
কোলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ সভার উদ্বোধক ও রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব। 'এলবার্ট হলে' 'সাম্প্রদায়িক নির্ধারণের' প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি, লিট, উপাধি। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ এর দশম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৩৬ ঃ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে ইস্তফা।

১৯৩৭ ঃ স্কটিশ চার্চ কলেজে 'বাংলা সাহিত্য সমিতি'র পক্ষ থেকে ৬২ তম জন্মদিনে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন।
বিদ্যাসাগর কলেজে ৬২তম জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপন।
ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে নার্সিং হোম-এ ভর্তি।
ডাঃ—বিধান চন্দ্র রায়ের পরীক্ষা।

১৯৩৮ ঃ বিখ্যাত মেডিক্যাল সার্জন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শরৎচন্দ্রের পেট অপারেশন (১২ই জানুয়ারী)।
১৬ই জানুয়ারী রবিবার সকাল দশটায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ।
৫-৪৫ মিনিটে কেওড়া তলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন।
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬১ বৎসর ৪ মাস।

শরৎ সাহিত্য : স্বদেশে বিদেশে

শরৎচন্দ্র কতো বড় শিল্পী ছিলেন, তা মহাকাল নির্ধারণ করবে, কিন্তু তিনি যে জনগণের শিল্পী, দেশ-বিদেশের বহু মণীষীই তা' স্বীকার করেছেন। তিনি সত্যভাষণে অকৃত্রিম ও অকপট। পৃথিবীর অগণিত নরনারীর হৃদয়রাজ্যে তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি যেমন বহু সমালোচিত, তেমনি সমাদৃত—দেশ-বিদেশের অনূদিত শরৎগ্রন্থবলীই তার অকাট্য প্রমাণ। ভারতের ১২ টি ভাষায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের অনুবাদই তাঁকে কিংবদন্তীর নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের ইংরেজী অনুবাদখানি রমাঁ রোলাঁর ভগিনী ফরাসীভাষায় মুখে মুখে অনুবাদ করে রমাঁ রোলাঁকে শুনান, তাতে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানান। দিলীপ রায়ের 'নিষ্কৃতির' ইংরাজী অনুবাদ "The Deliverence" পড়ে সুইডেনের এক বাংলা গবেষক ডঃ উইলিয়াম স্মিথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হৃদয়বান পাঠকেরা শরৎগ্রন্থ থেকে রস পেয়েছেন, তা তাঁর বিশাল অনুবাদ গ্রন্থের দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১। অসমীয়া ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা—৬টি। ১) বিরাজ বৌ, ২) চন্দ্রনাথ, ৩) দত্তা, ৪) দেবদাস, ৫) পরিণীতা, ৬) পথনির্দেশ। তালিকা সম্পূর্ণ নহে।

২। উড়িয়া ভাষায় শরৎচন্দ্রের অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা ৮টি—১) বিরাজ বৌ, ২) চরিত্রহীন, ৩) দত্তা, ৪) দেবদাস, ৪) পণ্ডিত মশাই, (শিক্ষক মহাশয়), ৬) পরিণীতা, ৭) পথের দাবী, * ৮) শেষ প্রশ্ন।

৩। মারাঠী ভাষায় অনুবাদের গ্রন্থের সংখ্যা—প্রায় ৪৪ টি। শরৎ সম্পর্কিত আলোচনার গ্রন্থ—৩ টি। ১) অনুরাধা-সতী-পরেশ, ২) অরক্ষণীয়া, ৩) মাধবী (বড়দি), ৪) মাধবী (বড়দি), ৫) বাল্যস্মৃতি, ৬) বিলাসী, ৭) বামুনের মেয়ে, (ব্রাহ্মণকি মুলগি) ৮) বিপ্রদাস, ৯) বিরাজ

বৌ (বিরাজ বহিনী), ১০) চন্দ্রনাথ, ১১) চরিত্রহীন—ডি, এস, গুরজার, ১২) চরিত্রহীন—বি, ভি, ভারেকার, ১৩) দর্পচূর্ণ, ১৪) দত্তা (বিজয়া)—বি, ভি, ভারেকার, ১৫) বিজয়া—প্রভাকর ব্যাস, ১৬) দেবদাস—বি, ভি, ভারেকার, ১৭) দেবদাস—বি, এস, গুরজার, ১৮) দেনা পাওনা—(ভৈরবী), ১৯) গৃহদাহ, ২০) হরিচরণ, ২১) হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ, মহেশ, ২২) কাশীনাথ—পি, বি, কুলকার্ণি, ২৩) কাশীনাথ—বি, ভি, ভারেকার, ২৪) নিষ্কৃতি, ২৫) মেজদি (হেমাজিনী), ২৬) নববিধান, ২৭) পল্লীসমাজ (গামভো গঙ্গা) ২৮) পণ্ডিত মশাই, ২৯) পরিণীতা—বি, ভি, ভারেকার, ৩০) পরিণীতা—শ্রীধর রাজারাম মারাঠী, ৩১) পথনির্দেশ, ৩২) পথের দাবী (ভারতী)—পি. বি, কুলকার্ণি, ৩৩) পথের দাবী (সব্যসাচী—বি, ভি, ভারেকার, ৩৪) রামের সুমতি-(ছোটভাই)—বি, ভি, ভারেকার, ৩৫) রামের সুমতি (সীমা)- যশোবন্ত টেন্ডুলকার, ৩৬) শেষের পরিচয়—ডি, এম গুরজার, ৩৭) শেষের পরিচয়—(আখেরকি ওলাব) বি, ভি, ভারেকার, (৩৮) শেষ প্রশ্ন, ৩৯) শুভদা, ৪০) স্বামী—বি, ভি ভাবেকার, ৪১) স্বামী (সৌদামিনী) শংকর বালাজী শাস্ত্রী, ৪৩) শ্রীকান্ত, ৪৪) চামির্নার (৪টি গল্পের সংকলন) ৪৪) প্রপঞ্চ কথা। এছাড়া শরৎ সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ ৩টি। প্রহ্লাদ নাহার যোশীর 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', সুমিত্ত ক্ষেত্রমন্ড এর 'জীবন স্বপ্ন' ও সন্ধ্যা কুলকার্ণির শরৎচন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

৪। হিন্দীতে শরৎচন্দ্রের পুস্তকের অনুবাদের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। জনপ্রিয় বইগুলি একাধিক লেখক অনুবাদ করেছেন। মোট অনুবাদের সংখ্যা প্রায় ১৭০ খানি।

যেমন অভাগীর স্বর্গ - ১, অনুরাধা—২, অরক্ষণীয়া—৪, ঝুমুর—১ বড়দিদি—৬, বামুনের মেয়ে ২, বিন্দুর ছেলে—৮, বিপ্রদাস- ৮. বিরাজ বৌ—১১, চন্দ্রনাথ—৩, চরিত্রহীন—৬, দর্পচূর্ণ, দত্তা—৪, দেনা পাওনা—৪, দেবদাস—৭, একাদশী বৈরাগী—৩, গৃহদাহ- ৪, হরিলক্ষ্মী—১, জাগরণ—১, কাশীনাথ—২, মেজদিদি—৪, নারীর মূল্য—২,

নববিধান--২, নিষ্কৃতি--৫, পল্লীসমাজ--১০, পণ্ডিত মশাই—৬, পরিণীতা --৮, পথের দাবী – ৬, রামের সুমতি—৭, সতী---১, শেষের পরিচয়—৯, শেষপ্রশ্ন – ৭, শ্রীকান্ত—৮, শুভদা - ৮, স্বামী – ৪, বিজয়া – ২, কমলা—২, প্রভৃতি।

এই সমস্ত অনুবাদের হিসাব থেকে সহজেই অনুমেয়, 'পল্লীসমাজ, বিরাজ বৌ, শেষের পরিচয়, দেবদাস পথের দাবী, রামের সুমতি, শ্রীকান্ত, শুভদা, শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি উপন্যাসগুলি হিন্দী ভাষাভাষীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তাছাড়া শরৎ সাহিত্য আলোচনা গ্রন্থের সংখ্যা কমবেশী ৩৫ খানি।

শরৎ সাহিত্য সমালোচক ও জীবনী লেখকদের মধ্যে বিষ্ণু প্রভাকর ইশ্বরনাথ মদন, ইলাচন্দ্র যোশী, শিবধন সিং, মহাদেব সাহা, মন্মথ নাথ দত্ত, নলিনী বিলোচাঁদ, ধ্যানকুমার জৈন, কমলপ্রসাদ রায়, ওমপ্রকাশ দত্ত, নাগার্জুন, দীপনারায়ণ সিংহ, রুদ্রপ্রসাদ শিবাণ্টম, হংসকুমার তিয়ারী, রমাপ্রকাশ জৈন, রূপনারায়ণ পাণ্ডে প্রমুখ সমালোচকগণ শরৎ সাহিত্যের মূল্যায়ণ করেছেন। হিন্দী কথাশিল্পী বিষ্ণু প্রভাকর বলেন—"To sum up, this much has to be acknowledged that Hindi fiction has been profoundly influenced and inspired by Sarat both directly and indirectly.

---

* উড়িয়া উপন্যাসিক ও 'পথের দাবী'র অনুবাদক শ্রীযুক্ত কালিন্দী চরণ পানিগ্রাহী শরৎসাহিত্য সম্পর্কে বলেন—"The indomitable influence of love which breaks through all boundaries of social relations as a storm, with which Sarat chandra stands aloof from his predecessors has very little stress in many of his novels. The unique touches of art, peculiar to the pen of Sarat Chandra, are however stamped on each and every character." (Sarat Chanda – The Artist of Human Soul – Kalindi Charan Panigrahi).

His influence has been rather more effective and wider in a subtle way. There was a time when his characters like Devdas, Parvati, Shrikant and Savitri were superb models with Hindi writers···. Hindi fiction shall never be able to forget him."

৫। পাঞ্জাবী ভাষায় শরৎচন্দ্রের পুস্তকের অনুবাদের সংখ্যা অল্প - মাত্র ৩টি। (১) বিরাজ বৌ - এইচ ডি. সাহিরে (২) চরিত্রহীন (আভারা)— জ্ঞানসিং, (৩) মেজদিদি (মঞ্জুলি দিদি)— এইচ. ডি, সাহিরে।

৬। গুজরাটী ভাষায় শরৎ সাহিত্যের অনুবাদের সংখ্যা প্রায় ৯৪। শরৎ-সংক্রান্ত আলোচনার বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২২ খানি। অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ— অনুরাধা - ৩, অরক্ষণীয়া - ৩, বড়দিদি — ৩, বৈকুণ্ঠের উইল—৩, বামুনের মেয়ে - ২, বারোয়ারী উপন্যাস — ২, বিন্দুর ছেলে—৫, বিপ্রদাস—২, বিরাজ বৌ—৫, ছবি—২, চন্দ্রনাথ—৪, চরিত্রহীন—৪, ছেলেবেলাকার গল্প—১, দত্তা—৬ দেবদাস—৬, দেনা পাওনা—১. গৃহদাহ—৫, জাগরণ— ১, কাশীনাথ—২, নব-বিধান—৩, নিষ্কৃতি—২, পল্লীসমাজ—৫, পণ্ডিত মশাই—৪, পরিণীতা - ২. পথের দাবী — ৩, শেষ প্রশ্ন—৩, শেষের পরিচয় — ২, শ্রীকান্ত - ২, শুভদা - ৩, অলকা- ১, স্বদেশ ও সাহিত্য - ১, স্বামী—৩, শরৎগ্রন্থাবলী—৫ অধ্যায়।

সমালোচকদের মধ্যে শ্রীকান্ত ত্রিবেদী, রমণ লাল গান্ধী, পান্নালাল পাটেল, রমণ লাল বসন্তলাল দেশাই, গোবর্ধন ত্রিপাঠী, মহাদেব হরিভাই দেশাই, প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রয়ী উপন্যাসিকের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—ঈশ্বর পেটলিকার, — চুনিলাল মাডিয়া, পান্নালাল পাটেল। এঁরা তিনজনেই শরৎ অনুরাগী লেখক। গুজরাঠী প্রবন্ধকার শিব কুমার যোশী তা অকপটে স্বীকার করেছেন - "Saratbabu influenced Pannalal Patel, Iswar peltikar and Chunnilal Madia, three of our out standing novelists who wrote Gujarat's countryside as their backdrop",

৭। তেলেগু ভাষায় শরৎসাহিত্যের অনুবাদের সংখ্যা প্রায় ৪৮ খানি। অনুবাদের তালিকা এইরকম ঃ— অনুরাধা – ২, অরক্ষণীয়া – ২, বড়দিদি (বড়ীবহিন)--২, বাল্যস্মৃতি – ১, বামুনের মেয়ে – ২, বিলাসী--২, বিন্দুর ছেলে – ১, বিপ্রদাস – ২, বিরাজ বৌ – ৩, চন্দ্রনাথ – ১, চরিত্রহীন — (চরিত্রহীনুলু)—২. চিঠিপত্র--(শরৎলেখালু) – ২, দর্পচূর্ণ--(গর্বভঙ্গম) – ১, দেবদাস – ৩, গৃহদাহ — (গ্রুহদাহনম) – ১, হরিলক্ষ্মী—১, জাগরণ--২, কাশীনাথ—১, মেজদিদি – (চিন্নকা) – ১, নববিধান – ১, নিষ্কৃতি—২, পল্লীসমাজ— (পল্লীজুলু) – ১, পরিণীতা—২, পথনির্দেশ—১, পথের দাবী —১, রমা—১, রামের সুমতি – ১, শেষের পরিচয়—২. শেষ প্রশ্ন— ২, শ্রীকান্ত—১, শুভদা – ৩, স্বামী—১। তাছাড়া, শরৎ সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের অনুবাদ ও সমালোচনা গ্রন্থের সংখ্যা প্রায়—১১ খানি। প্রখ্যাত তেলেগু সমালোচক গোরেপতি ভেংকট সুব্বায়ার 'শরৎ দর্শনম', কে, ভি, রামারেড্ডির—'শরৎবাবু-ঃ জীবিত সাহিত্য পরিচয়ম', শঙ্করাচার্য শাস্ত্রীর 'শরৎ কহালু' বিশেষ উল্লেখ্য। অন্ধ্রপ্রদেশে শরৎ সাহিত্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা তেলেগু সাহিত্যের সমালোচক ডঃ আদাপা রামকৃষ্ণ তাঁর 'Sarat chandra & the Telegu Novel' গ্রন্থে নির্ণয় করেছেন —" Sarat Chandra's influence is perceptible to a discerning eye in reeent Telugu fiction in the choice of themes, characterisation narrative technique and above all, in the manipulation of conversations in the works of a few writers."

৮। তামিল সাহিত্যেও শরৎসাহিত্যের অনুবাদ কম হয়নি। সরাসরি অনুবাদ হয়েছে প্রায় ৩৬ খানি গ্রন্থ। তাছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো গল্প ও উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। শরৎপ্রসঙ্গ আলোচনা ও অন্যান্য অনুবাদ প্রায় ১৫ খানি বই। পুস্তকের অনুবাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল – অনুপমার প্রেম--২, অনুরাধা, হরিলক্ষ্মী—১, বড়দিদি—১, বৈকুণ্ঠের উইল – ১, বামুনের মেয়ে (সন্ধ্যা)—২, বিপ্রদাস—১, চরিত্রহীন—১, দত্তা (পল্লী নটপু)—১,

দেনাপাওনা—২, দেবদাস — ১ গৃহদাহ--২, জাগরণ (অমরনাথ)—১, কাশীনাথ — ২, মেজদিদি — ২, হেমা — ১, নিষ্কৃতি — ২, পল্লীসমাজ — ১, পরিণীতা—১, পথের দাবী — ৩, পণ্ডিত মশাই—২, রামের সুমতি--২, শেষ প্রশ্ন, শ্রীকান্ত--১, শুভদা--১, স্বামী--১।

৯। মলয়ালাম ভাষায় শরৎচন্দ্রের বইয়ের অনুবাদ সংখ্যা ৩৮। অনুরাধা-সতী-পরেশ--২, বড়দিদি--১, বৈকুণ্ঠের উইল--২, বামুনের মেয়ে--১, বিন্দুর ছেলে -৩, বিপ্রদাস--১, বিরাজ বৌ--১, চন্দ্রনাথ--১, চরিত্রহীন--১, দর্পচূর্ণ--২, দত্তা--১, দেনাপাওনা--১, দেবদাস--২, হরিলক্ষ্মী--১, কাশীনাথ —১, মেজদিদি—১, নিষ্কৃতি — ২, পল্লীসমাজ — ১, পরিণীতা — ৪, পথনির্দেশ—১, রামের সুমতি—২, শেষ প্রশ্ন - ১, শ্রীকান্ত—৩, স্বামী — ১, বিজয়া—১,। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের আরো কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ ও আলোচনা পুস্তক আছে। এর সংখ্যা প্রায় — ৬টি।

এই প্রসঙ্গে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ-অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেন — "দক্ষিণ ভারতের একবন্ধু বলেছিলেন যে, তেলেগু ভাষায় অনুদিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ অন্ধ্রপ্রদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এক পথচলতি কাশ্মীরি বন্ধু বলেছিলেন যে পর্বত উপত্যকার বাসিন্দা হয়েও তিনি শ্যামল বাংলাদেশের কাহিনীগুলির মধ্যে তাঁর জীবনে ভীড় করে আসা অসংখ্য নরনারীর মিছিল দেখতে পান। তখন আমাদের মনে হয়েছিল ভারতবর্ষে একালের যদি কেউ আন্তঃপ্রাদেশিক লেখক থাকেন তবে তিনি শরৎচন্দ্র।" (শরৎ পরিক্রমা—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী) বাস্তবিক তাই। ভারতবর্ষের প্রায় সকলপ্রদেশে সবচাইতে তিনি জনপ্রিয় কথাশিল্পী।

৯। কানাড়া ভাষায় তাঁর অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৩ খানি। অভাগীর স্বর্গ—২, আঁধারে আলো - ১. অনুপমার প্রেম — ২, অনুরাধা ২, অরক্ষণীয়া — ২, বড়দিদি—২, বাল্যকালের গল্প — ১, বামুনের মেয়ে — ১, বিন্দুর ছেলে — ১, বিপ্রদাস—১, বিরাজ বৌ - ৩, চন্দ্রনাথ—২, চরিত্রহীন — ৩, ছবি--১, চিত্রা (ছবি, বিলাসী, মামলার ফল)--১, দর্পচূর্ণ--৩,

দত্তা—২, দেবদাস — ১, দেনাপাওনা—২, একাদশী বৈরাগী—১, গৃহদাহ — ২, হরিলক্ষ্মী — ১, কাশীনাথ--১, মহেশ — ১, মন্দির—২, মঙ্গল-সূত্র — ১, মেজদিদি—১, নারীর মূল্য — ১, নববিধান—২, নিষ্কৃতি — ১, পল্লীসমাজ— ২, পন্ডিত মশাই—১, পরেশ—১ পরিণীতা — ১, পথনির্দেশ —১, পথের দাবী—১, রামের সুমতি ও অনুরাধা — ৩, রসচক্র — ২ সতী —২. শেষ প্রশ্ন — ৩, শ্রীকান্ত—২ শুভদা – ৩, স্বামী – ২, বৈকুন্ঠের উইল — ২, বিজয়া — ৩। এগুলি ছাড়া আরো শরৎচন্দ্রের অনুবাদ ও সমালোচনা গ্রন্থের সংখ্যা ৩৩।

১০। উর্দু ভারতের অন্যতম উন্নত ভাষা। উর্দু ভাষাভাষীরা শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের প্রতি আগ্রহী ছিলেন দারুণ। উপন্যাস ও গল্প সবমিলিয়ে প্রায় ২০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে উর্দুত। উর্দুতে অনুবাদের সংখ্যা নিম্নরূপ—অরক্ষণীয়া (গরীব কি দুনিয়া)—১, বড়দিদি--১ বামুনের মেয়ে--(ব্রাহ্মণ কি বেটি)--১, বিরাজ বৌ--১, চরিত্রহীন (আভারা) --১, দেবদাস—১, গৃহদাহ—১, নিষ্কৃতি (শীকাস্ত) — ১, পল্লীসমাজ (দেহাতি সমাজ)—১, পন্ডিত মশাই (সমাজ কাদের) – ২, প্রায়শ্চিত্ত– ১, শেষপ্রশ্ন—১ হরিদাসী—১, ও আরো ৬টি গল্প-প্রবন্ধের অনুবাদ হয়েছে।

ভাষান্তরে শরৎ সাহিত্য ও আলোচনা কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নয়, ইংরাজী, ফরাসী, ইতালীয়, রুশ ও সিংহলী প্রভৃতি বিদেশী ভাষাতেও প্রসারলাভ করেছে।

অবশ্য, ইংরাজীতে যাঁরা শরৎ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করেছিলেন. তাঁদের অধিকাংশই বাঙালী। একমাত্র লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে ১৯২২ সালে Theodosia Thompson সাহেব ও K. C Sen এর যুগ্মসম্পাদনায় 'শ্রীকান্ত' বইখানি অনুদিত হয়। ক্ষিতিশ চন্দ্র সেনের শ্রীকান্ত দি অটোবায়োগ্রাফি অব এ ওয়ান্ডারর' ও দিলীপ কুমার রায়ের 'দি ডেলিভারেন্স' (নিষ্কৃতির অনুবাদ) ইংরাজীতে বই দুখানি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাছাড়া দিলীপ কুমার রায় কর্তৃক অনুদিত – 'Mothers and sons' (নিষ্কৃতি ও রামের সুমতির অনুবাদ) বইখানি

উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল ঘোষ কর্তৃক ৩ খানি বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ লক্ষণীয়। ১) The fire (গৃহদাহ), ২) The Betrothed (দত্তা), ৩) Queen's Gambit (চন্দ্রনাথ)। বোম্বে থেকে প্রকাশিত বিনয়লাল চ্যাটার্জীর 'চরিত্রহীন' এর ইংরাজী অনুবাদটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সাহিত্য একাডেমী (নিউ দিল্লী) থেকে প্রকাশিত শশধর সিংহ কর্তৃক অনূদিত 'The Drought and other stories' বইখানিতে শরৎ চন্দ্রের ৬টি সেরা গল্প সংকলিত হয়েছে। মহেশ, বিলাসী, আঁধারে আলো, রামের সুমতি, ছবি ও অভাগীর স্বর্গ। শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ণ করেছেন যথাক্রমে অধ্যাপক ডঃ এস. সি সেনগুপ্ত তাঁর 'Sarat Chandra: "Men Artist" গ্রন্থে হুমায়ুন কবীর তাঁর 'Sarat Chandra Chatterjee" গ্রন্থে এবং ইন্দর নাথ মদন তাঁর "Sarat Chandra Chatterjee. His mind and Art" গ্রন্থে।

ইটালিয়ান ভাষায় রমা দি কারলো 'শ্রীকান্ত' এর অনুবাদ করেন ১৯৪২ সালে। বইখানির নাম 'Srikanta di Sarat Chandra Chatterjee".

লিথুয়ানিয়ান ভাষায় 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন M. Subata Vicience; বইটির নাম 'Sudeginti Namal'.

রাশিয়ান ভাষায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এর অনুবাদের সংখ্যা ২। B Karsuskin Q S Cyin কর্তৃক অনূদিত। তাছাড়া আলেকশিভা ও এস সিরিন এর শ্রীকান্ত' এর অনুবাদখানি বহুল প্রচারিত।

ডঃ তারাপদ বসু কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত "Dans L' O euvre De Sarat Chandra Chatterjee" এইটি সমধিক প্রসিদ্ধ।

শরৎচন্দ্রের পুস্তকের জনপ্রিয়তা সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মগ্রন্থের মতো জনপ্রিয়। যদিও তাঁর ধর্ম ছিল 'মানবধর্ম'। তাঁর সাহিত্যে শাশ্বত কালের মানব মানবীর জয়গান ঘোষিত হয়েছে। হুমায়ুন কবীরের ভাষায় বলা যায়—"The consciousness deepened in him that it is man that motters, not his social stamp."